KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28 (চৌরিং) রোড, কলকাতা-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number 9/- 9/- 9/-	Year of Publication : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫ পৌষ, ১৩৫৫ ফাল্গুন, ১৩৫৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

সপ্তম বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৬৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিনামূল্যে মহাশূন্য-ভ্রমণ সম্পর্কিত সচিত্র পুস্তিকার জন্য দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড-এর বিজ্ঞাপন বিভাগে লিখুন।
পোঃ বক্স নং ৮৯, কলিকাতা-১

৪৫/১৪

৭ বর্ষ। ১১শ সংখ্যা

সমকালীন

ফাল্গুন। ১৩৬৬

॥ সূচীপত্র ॥

সুরের সন্ধানে। অমিয়নাথ সান্যাল ৬৫৩

থিওডোর গোল্ডস্টুকর। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৬৬০

অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোতে মূলধন। প্রিয়তোষ মৈত্রেয় ৬৬৫

সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৬৬৬

সাহিত্যে আজগুবিয়ানা। অজিতকৃষ্ণ বসু ৬৭৮

উপেন্দ্রনাথ। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৬৮৫

আলব্যের কেমু স্মরণে। নিরঞ্জন হালদার ৬৮৬

গান শোনা প্রসঙ্গে। নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৬৯০

নাটক না ম্যাজিক। প্রকাশ পাল ৬৯২

সমালোচনা। সোমেন বসু ৬৯৪

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

সপ্তম বর্ষ একাদশ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৬৬

সমকালীন

সুরের সন্ধানে

অমিয়নাথ সান্যাল

ইতিহাস-পূর্ব কালের মানুষ চোখে-দেখা জগতের সৌন্দর্য অনুভব করেছিল, সন্ধানও করেছিল। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর পূর্বেকার প্রাচীন পাথরের গায়ে খোদাই করা ছবির মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তরযুগের অরিগ্‌নেশিয়ান মানব-গোষ্ঠী সামান্য অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে সেই পাথরের গায়ে বিচিত্র ছবি এঁকেছিলেন। এরকম বর্ণশিল্প আর ভাস্কর শিল্পের নিদর্শন এখন পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে। সুন্দর সুন্দর রেখা গতি-ভঙ্গিমা আর পারস্পরিক সাম্য-ভাবগুলি এতই চমৎকার ও রমণীয় যে আধুনিকযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ও চিত্র-সমালোচকবর্গ একযোগে বিস্ময় প্রকাশ না করে পারেননি। চিত্র-ভাস্কর-কলা শিল্পের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে রোজারফ্রাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন। তিনি সমালোচনা করে বলেছেন,—'বিশেষ ক'রে এই অরিগ্‌নেশিয়ান রেখা-চিত্র-গুলির মধ্যে এমন কয়েকটি উত্তম গুণ আর বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, যা আজকের যুগের চিত্র-নিদর্শনের পক্ষেও বিরল।' ফ্রাই সাহেবের বক্তব্য পড়ে আমার কেবলই মনে হয়, পুঁথি-পাতি থেকে ইট-পাথর সুচিরকাল স্থায়ী বলেই ইতিহাস-পূর্ব মানুষের কিছু মনের কথা আর হাতের কাজের প্রমাণ রহস্য এখনও গোচর হ'তে পারল। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় এরকম অকাট্য প্রমাণকে বলতেন "পাথুরে প্রমাণ।" নিরেট সাল-তারিখঠাসা চৈতন্য কল্পনা-বুদ্ধিকে সহজেই অবহেলা করে। তবে পাথরে আর মাথায় ঠেকা-ঠুকি হ'লে অন্য রকমের পৌরাণিক চৈতন্যের দরজা খুলে যেতে পারে, এই ছিল শাস্ত্রী মহোদয়ের ইঙ্গিত।

কিন্তু—ইতিহাস-পূর্ব কালের মানুষ শব্দের বা সুরের অক্ষর লিপিও উদ্‌ভাবন করতে পেরেছিলেন, এ বিষয়ে পাথুরে প্রমাণও পাওয়া গেল না! তবে কি বুঝব, তখনকার মানুষ কথাই বলত না? তাদের কণ্ঠে কি গানের সুর ছিল না! তখনকার জননী কি ঘুম-পাড়ানি সুর দিয়ে অশান্ত শিশুর চোখে তন্দ্রা সঞ্চার করেন নি! তখন কি একটাও সুরেলা পাখি ছিল না? অথবা, থাকলেও সেকালের মানুষ পাখির সুর শুনে বিস্মিত পুলকিত হয়নি?—যেহেতু পাথরে খোদাই করা স্বর-লিপি পাওয়া যাচ্ছে না!

এ রকম এক তরফা রায় স্বীকার করে নেওয়ার পূর্বে চিন্তার কথা আছে।

মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা বলেন, মানব শিশুর সম্বিদ্ সর্বপ্রথমে শব্দই সন্ধান করে; শব্দ-প্রত্যয়ই হ'ল প্রাথমিক প্রত্যয়। চাক্ষুষ প্রত্যয় ও রূপ-সন্ধান কিছুকাল পরে ঘটে। সুতরাং শিশুর পক্ষে শব্দ-জগতের সৌন্দর্য্য বোধ করার বৃত্তি সর্বপ্রথমেই উন্মেষিত হওয়ার কথা। বস্তুত, এ রকম ঘটতে দেখা যায় না; সাধারণত। এর কারণ আছে। রূপ-সন্ধানী বৃত্তি পরে দেখা দিলেও, বাহ্য প্রকৃতির দৃশ্য পদার্থের রূপ, সংখ্যা ও বৈচিত্র্য শব্দ-জগতের শ্রব্য বস্তু থেকে অনেক গুণে বেশী হওয়ার কারণে রূপ-সন্ধানী বৃত্তির অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক আলোড়ন ঘটতে থাকে। এর ফলে, চক্ষুগ্রাহ্য ব্যাপার বা বস্তুর সৌন্দর্য্যবোধ শীঘ্রই ঘটে। অন্য দিকে, শব্দ-জগতে সুরেলা পাখি নিতান্ত বিরল; কাক, চিল, চড়ুই পাখিরাই দলে ভারি। আঁতুড় ঘর থেকে বার হয়ে এলেই যে প্রত্যেক শিশুর কান বাঁশী বা পিয়ানো বা বাঁশীর সুর শুনতে পাবে, এমন সম্ভাবনা এখনও নিতান্ত অল্প। সুতরাং, আদিম মানবের প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্ভব-অসম্ভব সুন্দর-অসুন্দর অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করলে বুঝতে পারি, তখনকার দেশ-কাল অনুযায়ী মানব বা মানবশিশুর পক্ষে দৃশ্য জগতের কিছু কিছু সৌন্দর্য্য অনুভব করাই সম্ভব হয়েছিল; কিন্তু শব্দ জগতের সৌন্দর্য্য বলতে কিছুই ছিল না। এর একটি মাত্র ব্যতিক্রম হ'ল মাতা-ধাত্রীবর্গের মুখের সোহাগের সুর, এবং ঘুমপাড়ানি গান। শিশুর শব্দ-সন্ধানী বৃত্তি দিয়ে আনন্দ বা চমৎকৃতি আহরণ করার প্রাথমিক সম্ভাবনা বলতে ঐ সোহাগের সুর আর ঘুমপাড়ানি সুর। তাও, বিচার করে দেখা যায়, সোহাগ-মধুর সুর বা ঘুম-পাড়ানি সুর যতই মধুর হ'ক—সংখ্যায় বড় বেশী ত' তিনটি বা চারটি সুর। অথচ—চক্ষুষ অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত আলোকের বাহনে সাদা, কালো, লাল, নীল, হলদে, সবুজ, কমলা রংএর ছড়াছড়ি, ঠেলাঠেলি! মানব-শিশু ও আদিম মানব সৌন্দর্য্যসন্ধানে যে সর্বপ্রথমে দৃশ্যমান জগতের দিকে ছুটে যাবে, এ আর এমন আশ্চর্য কি!

মনোবিজ্ঞানের অন্য একটা কথাও চিন্তা করা উচিত। শিশুরও বাল্যাবস্থাতেই সর্বপ্রথম বিস্ময়, পুলক, হর্ষ ও প্রীতির ভাবগুলি জেগে ওঠে। কষ্ট বা খেদ ত' আছেই; কিন্তু—এগুলি সৌন্দর্য্যসন্ধানী বৃত্তির উন্মেষ করে না বলেই সাম্প্রতিক আলোচনার বাইরে। যাই হ'ক, বিস্ময়, পুলক প্রভৃতি ভাবের উন্মেষের অনেক পরে নীতি ও সম্বন্ধের জ্ঞান, ব্যবহারিক বুদ্ধি ও হিতাহিত বোধ দেখা দেয়। এ সমস্ত নৈতিকজ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপারগুলি শিক্ষার প্রভাবেই সংস্কারের রূপ ধারণ করে, এ বিষয়ে মতভেদ নেই। কিন্তু এগুলি যথার্থত মানব-মনের স্বভাব-লক্ষণ কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় ও মতভেদ আছে। যাই হ'ক, সৌন্দর্য্যসন্ধানী বৃত্তিটি যে স্বভাবগত এ বিষয়ে কিন্তু মতভেদ নেই।

সকলেই লক্ষ্য করতে পারি যে নিতান্ত সহজ এবং অবশ্যই কিছু রমণীয় অনুভবের বশেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আপনা থেকে কিছু গানের সুর গুন্‌গুন্ করতে চেষ্টা করে, তালে তালে তাই দিতে চেষ্টা করে বা গাত্রভঙ্গি করতে চেষ্টা করে। এবং আপনা থেকেই হয়ত' কিছু ছবি বা রেখা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। এরকমের অদ্ভুত গ্রহ্যায় ও জীবন-সংগ্রামের মধ্যে কিছু মাত্র বাধ্যতামূলক সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায় না। যে সব ছেলেমেয়েরা গুন্‌গুন্ করে না, তালে তাল দেয় না, বা আপনা থেকেই ছবি আঁকেনা, তারা যে ভবিষ্যৎ জীবনে পরাজিত হ'তে বাধ্য এমন কিছুতেই বলা যায় না। আবার যারা বাল্যকাল থেকেই গুন্‌গুন্ করে বা ছবির আঁচড় টানে, মাত্র তারাই যে ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্থক করবে, এমনও কিছু নিশ্চয়তা নেই। বরং অনায়াসে মনে করা যায়, এগুলি হ'ল যেন ঐচ্ছিক প্রেরণা (অপশন্যাল ক্রেডিং) এবং এদের মূলে

সৌন্দর্য্যসন্ধানীবৃত্তি মোটের উপর অপ্রয়োজনীয় এক রকম ব্যবস্থা। জীবনের সমস্ত কিছু গুণ ধর্ম্ম বা কর্ম্ম যে প্রয়োজনীয় হ'তে বাধ্য, এমন ধারণা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে। দেহবিজ্ঞানবিশারদ জ্ঞানীরা এ কথা ভাল করেই বুঝিয়ে দিতে পারেন।

যাই হ'ক, শব্দ-প্রতীতি ও চাক্ষুষ-প্রতীতি এই দুটির সম্মিলিত ছোট্ট জগতের অভিজ্ঞতার মধ্যে মাত্র রমণীয় অনুভবগুলি মিলেমিশে বালক-বালিকাদের মনে সৌন্দর্য্যবোধ উন্মেষিত ক'রে, এবং নূতন করে সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষাও সৃষ্টি করে। এ রকম অবস্থায় যখন আমরা তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাদেরকে অ, আ, ক, খ প্রভৃতি কৃত্রিম অক্ষর-লিপি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি, তখন তাদের মনে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আলোড়ন বা বিপর্য্যয় ঘটে। কারণ, 'কমললেবু' নামের আদিতে 'ক' শব্দটি নেহাৎ মন্দ শোনায় না। কিন্তু—'কমলা' এবং অন্য সহস্র সহস্র ক-কারাদি শব্দ থেকে মাত্র 'ক' নামে একটা শব্দ বেছে নিয়ে, সেই শব্দটি কাগজের উপরে যখন লেখা হয়, তখন সেই লেখার মধ্যে না থাকে সৌন্দর্য্য, না থাকে কোনও ধ্বনি বা বস্তু-সম্বন্ধের মাধুর্য্য! ক-কার শব্দটি কাণে শোনা জগতের প্রতীতি; অধিকন্তু—"কাক ডাকে কা কা" অভিজ্ঞতার কারণে এই প্রতীতি অসুন্দরের কোঠায় পড়ে থাকারই কথা; ভাগ্য 'কমলা লেবু' ক'দিয়ে আরম্ভ, তাই রক্ষা। যাই হ'ক,—কানে-শোনা শব্দগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে, চোখে-দেখা বলতে জগতের গুদামের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে, স্থানান্তরিত, রূপান্তরিত এবং গুণান্তরিত করে শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনা করতেই হবে। কারণ, দুর্লভ মানব জন্মের ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামে এরাই হবে প্রধান সম্বল। বালক-বালিকারা এই ভবিষ্যৎ ফলের কথা চিন্তা করেনা। তারা অল্প-স্বল্প বিদ্রোহ করে; পরে, সহ্য করতে শেখে; শেষে সহ্য করাটাই সংস্কারে পরিণত হয়। ব্যাপারটি আগা-গোড়াই অদ্ভুত। অন্নসংস্থানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে বলেই শিক্ষাভিমানী মানব একে মেনে নিয়েছে। ফল কথা, অক্ষর-লিপির মধ্যে শব্দ-জগতের সৌন্দর্য্য ত' নেই'ই, এমন কি চাক্ষুষ-জগতের সৌন্দর্য্যও নেই। ছেলেমেয়েরা আপনা থেকে ফুল, বা বিড়ালের ছবি আঁকার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু—'মেঘদূত' কাব্যের লিপির অনুকরণ করতে চেষ্টা করে না।

তাই যদি হয়,—তাহ'লে আদিম মানবের পক্ষে সোহাগের সুরের, বা ঘুম-পাড়ানি গানের সুরের স্বরলিপি রচনা কী করে আশা করব! সুপ্রাচীন কোন কোনও মানব-গোষ্ঠী সহজাত সংস্কার দিয়ে কানে-শোনা জগতের সুর বা বিরল সৌন্দর্য্য অনুভব করেছিল। হয়ত' গুন্‌গুনও করত। কিন্তু—সেই সুরের বা সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক প্রতীক অর্থাৎ অক্ষর-লিপি বা স্বরলিপি উদ্ভাবন করেনি। রূপ দেখে চিত্রে প্রতিরূপ করা, অথবা, গান শুনে সুরের অনুকরণ করা—এ দু'টি কার্য্য নিতান্ত স্বাভাবিক অনুকরণধর্ম্ম। এ রকম ব্যাপার উদ্ভাবন শক্তির অপেক্ষা করে না। ইতিহাস-পূর্ব্বকালের সুরেলা মানুষ সুরের অনুকরণ করতে পারলেও সুরকে ধরে বেঁধে রাখতে পারেনি,—যেমন করে একালের গ্রামোফোন রেকর্ডে বা টেপ্-রেকর্ডে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। আজকের দিনেই কি পৃথিবীর সমস্ত গান-সুরের স্বরলিপি করা হচ্ছে! তা যখন হচ্ছে না, তখন ইতিহাসপূর্ব্ব-কালের মানবের কণ্ঠে সুর ছিল না, বা সম্বিদে সুর-স্মৃতি ছিল না, এ কথাই বা কি করে বলি।

সুর-স্মৃতির প্রসঙ্গে সুর-প্রতীতি নামে বিশেষ এক রকমের দেহ-সংবিদ যন্ত্রের ব্যবস্থার কথা এসে পড়ে। এ বিষয়ে দেহ-বৈজ্ঞানিক ও শব্দ-বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিদের পরীক্ষা-মূলক সিদ্ধান্ত অবশ্যই নির্ভরযোগ্য। জার্মানীর সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার হেলমহোলেজের বক্তব্যই অনুধাবন করা যায়।

মানুষের দু'কানের অন্দর-মহলে প্রত্যেকটিতে একটি করে আড়াই-পেঁচি সুরঙ্গ বা

নালিকা আছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, সুরপের চারিধারে অসংখ্য অণু-পরিমাণ তন্তু কোষ সাজান আছে; যেমন পিয়ানো যন্ত্রের তারগুলি। প্রত্যেকটি তন্তুকোষ এক একটি সুর বা ধ্বনির শক্তিতে বর্ণিত বা অনুরণিত হ'তে পারে। এই অনুধ্বনির তরঙ্গ-কম্পনগুলি শব্দানুভবিক স্নায়ুর মাধ্যমে বাহিত হয়ে সংবিদের মধ্যে সুরের উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ বাইরের আকাশ বয়ে কান পর্যন্ত যেটা আসে সেটা হ'ল মাত্র শব্দ-তরঙ্গ; সুর নয়। কানের অন্দর মহলে ভাল-মন্দের যেন একটা বাছাই হয়। ভাল জিনিষটাই স্নায়ুগত কম্পন বা উত্তেজনার রূপে যখন সংবিদে ঘা দেয়, তখন সেটা হয় সুর! এই সুর বস্তুত একটি প্রতীতি মাত্র। সংবিদ্ বা চেতনা বারে বারে একই রূপে উত্তেজিত হ'লে, এবং সুর-প্রতীতি সুষ্ঠু ও স্থায়ী হ'লে সংবিদের মধ্যে 'সুর-স্মৃতি' নামে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গান-বাজনা করা বা শোনার পক্ষে এই সুর-স্মৃতির ব্যবস্থা একেবারেই ন্যূনতম অপরিহার্য। কারণ, সুরের পর সুর উত্তেজিত হচ্ছে; পূর্ববর্তী সুর স্মৃতিতে না জমলে সমস্তই বিফল। যাই হ'ক, ঐ আড়াই পেঁচি সুরপ্ত, তন্তুকোষ, স্নায়বিক উত্তেজনা এবং সুরপ্রতীতি এই চারিটি মিলে ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণই বাস্তব ও দৈহিক। এই ব্যবস্থার ফলে সুর-প্রতীতির অধিকন্তু অন্য এক রকমের সংস্কার গড়ে ওঠে। যথা,—নিতান্ত সাধারণ মানুষ, যে একবার মাত্র বেহালার সুর শুনেছে আর কণ্ঠের সুর শুনেছে, সেও না দেখে মাত্র সুর শুনেই বলতে পারে, এটা বেহালার আওয়াজ, না কি কণ্ঠধ্বনি। আরও আশ্চর্য এই যে, সাধারণ মানুষ আর উঁচু দরের শিল্পী এঁদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা নেই। কথাটি হ'ল যেমন—মানুষের হাতে আঙ্গুলের পেশী বিন্যাস একই রকম; কেউ হয়ত, বীণা বাজান, কেউ বা সেলাই করেন। বীণাবাদন পক্ষে বা সেলাইএর কাজ পক্ষে পৃথক ব্যবস্থা করতে হ'লে, দেহ-প্রকৃতি তার চাকরি ছেড়েই দিত।

মানব ইতিহাসের অতি-প্রাচীন যুগেই এই বিচিত্র ব্যবস্থা ঘটে গিয়েছিল অনুমান করা যায়। অন্তত, অসম্ভব নয়। কারণ সুরবোলা পাখিরাও স্বভাবজন্য কাকলির অতিরিক্ত সাঙ্গীতিক সুর অনুকরণ করতে পারে, এ কথা সত্য। পাখি মানুষ থেকেও আদিমতর জীব। তার কানের মধ্যে যদি ওরকম জৈব-প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবস্থা থাকতে পারে তাহ'লে আদিম গোষ্ঠীর মানবের মধ্যে কোন কোনও মানব-গোষ্ঠীর পক্ষে ওরকম ব্যবস্থা পূর্বসিদ্ধ রূপে থাকায় এমন আশ্চর্য কি!

অবশ্য, আদিম মানব বজ্রধ্বনি শুনে কানে হাত-চাপা দিয়েছে, হিংস্রক বন্য জন্তুর নানা রকমে উচ্চারিত শব্দ শুনে ত্রস্ত ও সতর্ক হয়েছে; গাধার মুখের উল্লাস-ধ্বনি আদিম মানবের কানেও উদ্‌ভট বোধ হয়ে থাকবে। আদিম মানব যে শব্দ বাছাই করতে পেরেছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, এ বিষয়ে অক্ষম হ'লে হিংস্র প্রাণীর কবলে পড়ে কোনও মানুষও হয়ত বেঁচে থাকতে পারত না। এবং—শব্দ-বাছাই করার শক্তি থেকেই ক্রমে ক্রমে সুর বাছাই করার শক্তি ও প্রবণতা উদ্‌ভূত হয়েছিল সন্দেহ নেই; কারণ, সুর যতই মধুর হ'ক, সমস্ত সুরই মূলে শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। এক কথায়, শব্দ-মাধুর্য বোধ করার শক্তি যে পরে এবং ক্রমশ দেখা দিয়েছে, এ কথা আমরা মেনে নিতে পারি।

শব্দ-মাধুর্যের বিশিষ্ট প্রত্যয় দেখা দিতে হয়ত যুগের পর যুগ কেটে গিয়েছে। জগতের সর্বস্থানের আদিম মানবই যে সমান ভাবে মাধুর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল এমন মনে করা যায় না। যে দেশের মানব-গোষ্ঠী সহনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শান্তিময় জীবন যাপন করার সুযোগ পেয়েছিল, বিশেষ করে, নাতিশীতোষ্ণ পরিমণ্ডলের মধ্যে যে সকল দেশে বা যে দেশে বসন্তাদি করে ছয় ঋতুর সম্যক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেই দেশের লোকই জৈবোত্তর ও

অপ্রয়োজনীয় সৌন্দর্য-সন্ধানের কার্যে অগ্রণী ছিল—এরকম সিদ্ধান্ত করা অযুক্ত নয়। কারণ, সৌন্দর্য, মাধুর্য, লাবণ্য বলতে গুণ ও ভাবগুলি সর্বথা দেহের স্নায়ুমণ্ডলীর অবাধ ক্রিয়া, এবং বিশেষ করে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সুকুমার বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। উৎসব-উত্তেজনার **হুড়োহুড়ি, চিৎকার-কোলাহল, আসবাদি পানের সহযোগে বাসন প্রমত্ততা এবং অনুক্ষণ শত্রু প্রত্যাশায় সাজ-সাজ মনোভাবের মধ্যে দিয়ে** ইতিহাস-পূর্বকালের মানব গোষ্ঠী যে শব্দ-মাধুর্যের সন্ধান পায়নি একথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ—শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন দু'রকম ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। একটি মোটা, অন্যটি চিকন। চট শেলাই করার ছুঁচ হল মোটা; সেইটেই আগে দেখা দিয়েছে। আর কাশ্মিরী শালের উপরে লতা-পাতার নক্‌সা তোলার ছুঁচ হল চিকন্। নক্সা তোলার কারণে শালটি যে বেশী গরম হয়, তা নয়। তবুও—অপ্রয়োজনীয় সৌন্দর্য বোধ উন্মেষিত হয়েছিল বলেই ত শালের উপরে নক্সার সাধ হয়েছিল, আর, সাধ হয়েছিল বলেই ত' কামারকে সাধ্য-সাধনা করে নক্সা-তোলার ছুঁচ যোগাড় করতে হয়েছিল! এবং—প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নানা রংএর ফুল আর নানা রং-এর লতা পাতার রমনীয়তা বোধ না হলে—কাশ্মিরী ওস্তাদ্‌বর্গ ওরকম আয়াস-সাধ্য কাজে হাতই লাগত না। মানুষের সংবিদে **সুকুমার বৃত্তির** অভ্যুদয়ের পক্ষে এই হল সাধারণ ইতিহাস। সমস্ত চারুশিল্পকলা সুকুমার বৃত্তির অপেক্ষিত। মাটির ঘরের উঠানে গোবর-জল ছড়া দেওয়া হয়, জৈব প্রয়োজনে সন্দেহ নেই। কিন্তু আল্পনা শিল্পটি আগাগোড়াই অপ্রয়োজনীয় সুকুমার বৃত্তি থেকে উদ্‌ভূত। অনুরূপভাবে আমরা দেখছি, শিক্ষা-সভ্যতার অভিমান বড়াই করেও মানুষ আদিম উন্মত্তভাবগুলি আঁকড়ে ধরছে, এবং এরকম আচরণের পক্ষে দার্শনিক ওকালতিও আরম্ভ করেছে। আবার এও দেখছি যে,—যাকে আমরা কুসংস্কার ও অজ্ঞতা বলি, সেই কুসংস্কার ও অজ্ঞতার বোঝা ঘাড়ে করে, দুটি নিরক্ষর মানুষ একটু বিরলে বসে মৃদু স্বরে রহস্যালাপ করছে। তাদের মাঝখানে একটি আল্‌গা বীণা রয়েছে। বীণার জোয়ারী সাফ্ হচ্ছে! জোয়ারী সাফ না হলে যে সর্বনাশ! আওয়াজে রেশ বা শাস্ বলতে কিছুই যে থাকবে না; আর, তা না থাকলে মীঁড়ের মজাই বা কিরকমে হবে! মীঁড়ই যদি মনের মত না হল, তাহলে এই যন্ত্রটি তৈরী করার কষ্টত একেবারেই পণ্ডশ্রম। তবে কি, ভেঁপু আর ট্রম্‌বোন্, বাজিয়ে রাগালাপ করতে হবে! জান্ কবুল,—সে আমরা পারব না। এই কারিগর আর বীন্‌কারকে দেখে মনে হল—এরা যতই মূর্খ হক, এদের জীবন ভারতীয় সংস্কৃতির শাস্ (শ্বাস) ও রেশ্ (অনুরণন) টেনে চলেছে, মাত্র একটি সুকুমার বৃত্তির প্রেরণায়! এদের মধ্যেও আদিমতা আছে, কিন্তু এরা এতই অশিক্ষিত যে তাদ বড়াই করে না, তাকে পালিশ করে শ্লোগান-প্রোসেশন করে না বা পোষ্টার চিত্রে প্রচার করে না।

মানুষের দেহ-সংবিদে সুর-অধিষ্ঠান ব্যবস্থা অন্য একরকম দৃষ্টিতে বিস্ময়জনক। নিতান্ত সাধারণ মানুষের কানের মধ্যেও কমপক্ষে দশ-বারো সপ্তকের ব্যাপ্তিগত প্রায় আড়াই-শত রকমের শ্রুতিভেদের ব্যবস্থা রয়েছে। ইউরোপে আট সপ্তকের পিয়ানো তৈরী হয়েছে। অথচ—জগতে এপর্যন্ত কালে গীত-রচয়িতা ব্যক্তিবর্গ যতো কিছু গান বেঁধেছেন, বা স্বরলিপি তৈরী করেছেন, তার মধ্যে এমন একটি গানও নেই, যার সুর পরিকল্পনা দু সপ্তকের চেয়েও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। **সুর-প্রতীতির সম্ভাবনার জগৎ হল দশ সপ্তকের।** কিন্তু গড় পড়তায় কণ্ঠের শক্তি হল মাত্র দু-সপ্তকের! দেহ প্রকৃতি কণ্ঠের প্রতি এত কৃপণ কেন? বস্তুত, কৃপণ নয়। **কথা বলতে শিখে অবধি আজ পর্যন্ত কালে মানুষ এত বেশী কথা বলেছে, এত বেশী চিৎকার করেছে,** যে কণ্ঠ নামে সুরের যন্ত্রটি তার সৌকুমার্যের উচ্চ সীমায় উঠতে পারল না! **কণ্ঠটি বাগযন্ত্র নয়; বাগযন্ত্র হল আস্য বা মুখ-গহ্বর,** যার আদি আর উপান্ত থেকে ককারাদি মকার পর্যন্ত বর্ণ-শব্দগুলি উদ্‌ভূত

হয়। **কণ্ঠ হল মূলে সুর-যন্ত্র বা স্বর-যন্ত্র।** এই সুকুমার যন্ত্রটি দু'দিকে দু'রকমের বিড়ম্বনার চাপে বিমর্ষ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। গানের মধ্যে কণ্ঠের স্ফূর্তি পরিস্ফুট হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু, আবেগের সময়ে প্রায়ই আর্তনাদ শুনি; রুদ্ধ আক্রোশ দেখা দেয় নিষ্ফল নিরর্থক চিৎকারের রূপ ধারণ করে। একদিকে ক-কারাদির চিৎকার-চাহিদা, অন্য দিকে ফুস্‌ফুস্‌ নামে হাপর যন্ত্রের ভাবাবেগ জনিত অস্বাভাবিক উত্তেজনা; এই দুএর মধ্যে পড়ে কণ্ঠ কতই বা উন্নতি লাভ করবে! এই কারণেই কণ্ঠ যন্ত্র তার পূর্ণ কমনীয়তা ও বিশদতা এখনও লাভ করেনি; মধ্য পথে, মুদারা স্থানটি পরিক্রম করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সমে এসে বিশ্রাম ভোগ করতে চায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা-বিচার দিয়ে কণ্ঠ ও বাগযন্ত্র সম্বন্ধে যেসকল সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, ভারতের প্রাচীন যুগের সঙ্গীতপ্রজ্ঞ মুনি-ঋষিরা কি সেরকম সত্য নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন?

এরকম প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলব,—এই বিশেষ ব্যাপারে বেদ-উপনিষদের মুনি-ঋষিরা যদি সত্য দৃষ্টি সম্পন্ন না হয়ে থাকেন তাহলেই বা ক্ষতি কি! যে সকল মুনি-ঋষিরা আইস-ক্রিম বা বিরিয়ানী পোলাও তৈরী করতে জানতেন না; শাল-জামেয়ারের ভেদাভেদ বুঝতেন না; বিজলী বাতি, এমন কি টর্চ-লাইট ও কল্পনায় আনতে পারেন নি। তাতে কি জগতের ক্ষতি হয়েছে নাকি, ভারতীয় সংস্কৃতির অমর্যাদা ঘটেছে!

দ্বিতীয় কথা এই যে—সুপ্রাচীনকালের সঙ্গীত-প্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ দু'চারজন মুনি যে বাগ্‌যন্ত্র ও কণ্ঠযন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য জানতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সকলেই যে জানতেন এমন কথা মনে করা উচিত নয়। এর প্রমাণ হল,—বাগ্‌দেবী ভারতীর ধ্যান, আর বীণাধরা সরস্বতীর ধ্যান। বাক্‌ অর্থাৎ বৈদিক বাগ্‌দেবী হলেন বর্ণ শব্দ-মন্ত্র-বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী ঈশ্বরী বিশেষ। **ইনি ক-কারাদি শব্দের সুষ্ঠু সফল উচ্চারণ দিয়ে যজ্ঞকারী সাধককে অনুগৃহীত করেন।** কিন্তু—ইনি কথাধিষ্ঠাত্রী রূপে গণ্য হননি, বীণাদির অধিষ্ঠাত্রী রূপেও এঁকে পাইনে। অন্য দিকে, সরস্বতী বা সারদা বা বীণাপাণি হলেন **সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।** এবং—যে আঙ্গুলে বীণা বাজান সম্ভব হয়, যে আঙ্গুলে লেখনী ধারণ করে মনের ভাব প্রতিফলিত করা যায়, সরস্বতী সেই বীণা-লেখনী বিদ্যার দেবতা।

অনুমান করা যায় বীণাযন্ত্র ও লেখনীর উদ্‌ভাবনের সময়েই সরস্বতী দেবীর ধ্যান মূর্তি কল্পিত হয়েছিল। অন্য কথা এই যে, বৈদিক অর্চনাকারী সম্প্রদায় কণ্ঠের সুর অর্থাৎ স্বর-গুলিকে বিশেষ আমল দেননি, এবং আস্য প্রযত্ন সম্ভূত বর্ণোচ্চারণকে তাঁরা দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রসূ মনে করেছিলেন। বস্তুত, আস্য অর্থাৎ মুখ, এবং কণ্ঠের বাস্তব ভেদ হয়ত এঁরা জানতেন না। সরল কথা এই যে মুখ ও মুখগহ্বর (টন্‌সিল পর্যন্ত) চোখে দেখা যায়, কিন্তু কণ্ঠ (ল্যারিংস্‌) চোখে দেখা যায় না। ফলে, সাধারণ ধারণা এই হয় যে—কথা ও সুর একই যন্ত্রের কৃতিত্ব। কথা কাজে লাগান যায়, সদা সর্বদার জন্য, এমন কি গালাগালির জন্যও। কিন্তু সুর সর্বথা কাজে লাগেনা; এমন অনেক কাজ ও কথা আছে, যাতে সুর প্রক্ষেপ দিলে কথা ও কাজ দুইই পণ্ডশ্রম হয়। সুতরাং—ব্যবহারের দিক চিন্তা করলে, **সুরের চেয়ে কথাই** বড়। খুব সম্ভবত, এই ধারণার বশেই "সঙ্গীত-রত্নাকর" গ্রন্থের প্রণেতা শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্বাকঃ।
বনসো ব্যবহারোঽয়ং নাদাধীনমতো জগৎ ॥ ২ ॥ (১ম স্বরাধ্যায় দ্বিতীয় শ্লোক)

এর অর্থ ঃ—নাদ দ্বারা ককারাদি বর্ণ ব্যক্ত হয়; বর্ণ থেকে পদের সৃষ্টি; পদ থেকে বাক্যের উদ্‌ভব; বাক্য দিয়েই ত' ব্যবহার সিদ্ধ হয়েছে। অতএব—সমস্ত জগৎ নাদেরই অধীন।

বক্তব্যটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আজ পর্যন্ত ব্যবহারাজীব জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে এসেছেন, মাত্র কথা বলে আর সার্থক বক্তৃতা করে, কোনও গীত-বাদ্য শিল্পী তার একচতুর্থাংশও গান-বাজনা করে উপার্জন করতে সক্ষম হননি।

সুরের কথায় ফিরে আসা যাক্‌। সুরের জগৎ, অর্থাৎ কথা-বর্জিত বিশুদ্ধ সুরের জগৎ বেশীর ভাগই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জগৎ। আমরা পত্র-মর্মরের মধ্যে, নির্ঝরের শব্দের মধ্যে, বিহগ-কাকলির মধ্যে, সুর খুঁজি। কিন্তু—বস্তুত, সেখানে সুর নেই, আছে শুধু মর্মর ধ্বনি, কুলকুল শব্দ, কিচির-মিচির কোলাহল। শব্দের জগতে সুরের চেয়ে অ-সুরের প্রাধান্যই চিরন্তন সংবাদ। নেহাৎ—দেহ-সংবিদের মধ্যে সুর-বোধের ব্যবস্থা ছিল বলেই আমাদের অনামিক পূর্ব পুরুষ গোষ্ঠী অসুর কোলাহলের মধ্যে জীবন যাপন করতে থেকেই কিছু সুর ও স্বর-সৌন্দর্য অনুভব করতে পেরেছিলেন।

থিওডোর গোল্ডষ্টুকর

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী প্রুশিয়ার (জার্মানী) অন্তর্ভুক্ত কনিগ্‌সবুর্গ নগরীতে এক ইহুদী পরিবারে থিওডোর গোল্ডষ্টুকর (১৮২১-১৮৭২) জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষালাভান্তে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব, দর্শন ও সংস্কৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক ভিল হেলম শ্লেগেল ও ফন্ খৃষ্টিয়ান লাজেন এই সময় বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিতেন। এই মনীষীদ্বয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষালাভের জন্য ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে গোল্ডষ্টুকর বননগরীতে চলিয়া আসেন। এই সময়ে অধ্যাপক লাজেনের সম্পাদিত পত্রিকায় অমরকোষ সম্বন্ধীয় তাঁহার একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। তরুণ শিক্ষার্থীর এই প্রবন্ধ বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুই বৎসর বননগরীতে যাপন করার পর গোল্ডষ্টুকর পুনরায় কনিগ্‌সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তথাকার 'ডক্টরেট' লাভ করেন।

অতঃপর তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত রূপক নাটক জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। কনিগ্‌সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক রোজেনক্রান্জ তাঁহার তরুণ শিষ্যের এই নিপুণ অনুবাদ পাঠ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত ও বিস্মিত হন। তাঁহার সম্পাদনায় পুস্তকখানি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গোল্ড ষ্টুকরের ভূমিকা সহিত প্রকাশিত হইয়া ইউরোপের পণ্ডিতগণের প্রশংসা অর্জন করে। অনুবাদক হিসাবে গোল্ডষ্টুকর এই পুস্তকে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে সম্মত হন না। পুস্তকের সম্পাদক হিসাবে শিক্ষাগুরুর নাম জড়িত থাকুক, বিনীত শিষ্যের ইহাই অভিলষিত ছিল। প্যারীনগরী এই সময় ভারত বিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গোল্ডষ্টুকর সংস্কৃতচর্চার সুযোগলাভের উদ্দেশ্যে প্যারী আসেন ও তিনবৎসর সেখানে অবস্থান করেন। এখানে তিনি প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ্ ইউজেন বুর্নফের সংস্পর্শে আসেন। জ্ঞানবৃদ্ধ বুর্নফ যুবক গোল্ডষ্টুকরকে তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। "ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস" রচনা বুর্নফের জীবনের অন্যতম কীর্তি। এই পুস্তক রচনায় বুর্নফ গোল্ডষ্টুকরের প্রভূত সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে স্বল্পকালের জন্য গোল্ডষ্টুকর ইংল্যাণ্ডে আসেন। বডলিয়ন পাঠাগারও ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথিগুলি পর্যবেক্ষণ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ইংল্যাণ্ডে তিনি প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনীষী হোরেস হেম্যান উইলসনের সহিত পরিচয় লাভ করেন। কিছুকাল পর তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া আসেন। ফ্রান্স হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কনিগ্‌সবুর্গ প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মহাভারতের জার্মান অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই, সম্ভবতঃ অনুবাদটি গোল্ডষ্টুকরের নিজের মনঃপূত হয় নাই। দুই বৎসর কনিগ্‌সবুর্গে অতিবাহিত করিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গোল্ডষ্টুকর ভারতবিদ্যাচর্চার অপর এক প্রধান কেন্দ্র বার্লিন আগমন করেন ও দুইবৎসর তথায় বিদ্যাচর্চায় অতিবাহিত করেন। এই সময় ভারতবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতপ্রবর আলেকজাণ্ডার ফন্ হামবোল্ট বার্লিনে বাস করিতেন। হামবোল্টের সুবিখ্যাত 'কসমস' পুস্তকের ভারত সম্বন্ধীয় দীর্ঘ অংশটি গোল্ডষ্টুকরের রচনা। গোল্ডষ্টুকরের স্বাধীন রাজনৈতিক মতবাদ জার্মানীর তদানীন্তন শাসন কর্তৃপক্ষের মনোমত

ছিল না। অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি হিসাবে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বার্লিন ত্যাগের নির্দেশ পাওয়ায় তিনি পটাসডামে চলিয়া আসেন।

কিছুদিন পর অনুরাগী বন্ধুদের চেষ্টায় বার্লিন ত্যাগের আদেশ প্রত্যাহৃত হইলেও তিনি আর বার্লিনে ফিরিলেন না। এই সময় হোরেস হেম্যান উইলসনের নিকট হইতে তাঁহার বিখ্যাত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের নূতন সংস্করণ প্রস্তুতের অনুরোধ পাইয়া তিনি অবিলম্বে ইংল্যাণ্ডে চলিয়া আসেন। ইণ্ডিয়া হাউসে রক্ষিত সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণই তাঁহার ইংল্যাণ্ড আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে গোল্ডষ্টুকরের নাম ইতিমধ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গ—মাক্সমুলর, হামবোল্ট, বুর্নফ প্রভৃতি তাঁহাকে সংস্কৃতভাষার অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া গণ্য করিতেন। এই সব কারণে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক সংস্কৃত অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। গোল্ডষ্টুকর সানন্দে এই পদ গ্রহণ করেন এবং আজীবন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শত শত ছাত্রের নিকট সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া দেন। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবিদ্যাবিদ্ বহু মনীষী গোল্ডষ্টুকরের অন্তেবাসী। ভারতবিদ্যা ও ভারত প্রেমের দীক্ষা ইহাঁরা গোল্ডষ্টুকরের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধ্যাপনার অবসরকালে গোল্ডষ্টুকর বৈদিক সাহিত্য, সংস্কৃত দর্শন, স্মৃতি ও ব্যাকরণের চর্চায় গভীর ভাবে আত্মনিবেশ করেন। হিন্দু আইন বিশেষতঃ হিন্দু উত্তরাধিকার বিষয়ে গোল্ডষ্টুকরের মতামতই তৎকালে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সংক্রান্ত অতি জটিল বিষয়ে প্রিভিকাউন্সিল ও ভারত গভর্ণমেণ্ট সর্বদাই তাঁহার পরামর্শ লইতেন ও তাঁহার সুচিন্তিত পরামর্শ মতই এইসব মামলার নিষ্পত্তি হইত। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্রান্ত ও সুসম্পন্ন তথ্যানুসন্ধান ও তাহার সুসমঞ্জস উপস্থাপন গোল্ডষ্টুকরের পাণ্ডিত্যের প্রধান লক্ষণ ছিল। কোন সন্দেহযুক্ত অসম্পূর্ণ তথ্য তিনি জনসমাজে উপস্থিত করিতেন না। ভ্রান্ত তথ্য সম্বলিত কতকগুলি পুস্তক লিখিয়া সুলভ খ্যাতি লাভ করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। বিদ্যার জন্যই তিনি বিদ্যাব্রতী ছিলেন অর্থ বা খ্যাতির দিকে তাঁহার কোনই লক্ষ্য ছিল না। এই কারণেই তিনি তাঁহার উপর ন্যস্ত সংস্কৃত ইংরাজী অভিধানের মাত্র 'অ' অক্ষর সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন, অ শেষ করিতে ৪২০টি বড় পৃষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছিল। উপরোক্ত কারণেই তাঁহার বহু রচনা তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইতে পারে নাই। জনশ্রুতি আছে যে তাঁহার নির্দেশ ছিল তাঁহার মৃত্যুর পর যেন তাঁহার কোন অসমাপ্ত রচনা প্রকাশ করা না হয়। যে সব রচনার অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ নহেন তাহা প্রচারের দ্বারা ভ্রান্ত মতের পরিপোষকতা করা হইবে এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।

ইণ্ডিয়া হাউসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে গোল্ডষ্টুকর কুমারিল ভট্টের ভাষ্যসহ "মানবকল্প সূত্র" নামে একটি তথ্যবহুল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডমূলক অমূল্য পুস্তক আবিষ্কার করেন। এই পুস্তকের একটি প্রতিলিপি (ফ্যাক্‌সিমিলি) সংস্করণ তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকের ভূমিকা স্বরূপ তিনি মীমাংসা দর্শন, বৈদিকক্রিয়া কাণ্ড, সংস্কৃত ভাষায় পাণিনির স্থান, ও পাণিনির ব্যাকরণ বিষয়ে এক গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেন। ব্যাকরণ ও সাহিত্য বিষয়ে উচ্চকোটির গবেষণার নিদর্শন স্বরূপ এখনও গোল্ডষ্টুকরের এই রচনাটি স্বমহিমায় ভাস্বর হইয়াছে। এই আলোচনাটি পরে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় (পাণিনি হিজ্ প্লেস্ ইন স্যান্সক্রিট্ লিটরেচার)।

মাধবাচার্যের "জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তার" নামক মীমাংসা দর্শনের পুস্তক সম্পাদনের

উদ্দেশ্যেও গোল্ডষ্টুকর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করেন। এই পুস্তকের বৃহৎ পাঁচখণ্ড প্রস্তুত করিতে করিতেই তাঁহার জীবনান্ত হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ কাউয়েল এই সম্পাদন কার্য গোল্ডষ্টুকরের মৃত্যুর পর সম্পন্ন করেন।

ডাঃ গোল্ডষ্টুকর 'এথেনিয়ম', 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টির রিভিউ' প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকায় ও চেম্বার্স সাইক্লোপিডিয়ায় ভারতের সাহিত্যসংস্কৃতি সংক্রান্ত নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সমস্ত রচনার কিয়দংশ গোল্ডষ্টুকরের মৃত্যুর পর "লিটারারী রিমেনস্ অফ প্রফেসর ডাঃ থিওডোর গোল্ডষ্টুকর" নামে লণ্ডন হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই বিষয়বৈচিত্র্য বন্ধন প্রবন্ধাবলীতে ডাঃ গোল্ডষ্টুকরের বহুবিস্তৃত জ্ঞানের বিস্ময়জনক পরিচয় আছে। অল্প কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা হইতে ডাঃ গোল্ডষ্টুকরের প্রবন্ধাবলী সঙ্কলন দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (প্রকাশক সুশীল গুপ্ত)।

ডাঃ গোল্ডষ্টুকর গ্রেট্ ব্রিটেনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন—সোসাইটির বহু অধিবেশনে তিনি নানা মূল্যবান নিবন্ধ পাঠ করেন। আলোচ্য বিষয়ে নিত্যনূতন উপকরণ সন্ধান তাঁহার বিশেষত্ব ছিল—এই জন্য কোন প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি তাহা সহসা মুদ্রিত হইতে দিতেন না। তাঁহার অনুমতি না পাওয়ায় সোসাইটিতে পঠিত তাঁহার রচিত এই সব প্রবন্ধ সোসাইটির পত্রিকায় বা অন্যত্র প্রকাশিত হইতে পারে নাই। গোল্ডষ্টুকর বহুকাল যাবৎ ইংল্যাণ্ডের ভাষাতত্ত্ব সমিতির সভাপতি ছিলেন। সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে স্যান্সক্রিট্ টেক্সট্ সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। গোল্ডষ্টুকরের মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠান হইতেই তাঁহার সম্পাদিত জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তারের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ডাঃ গোল্ডষ্টুকর অবিবাহিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। প্রচলিত অর্থে সংসারী মানুষ না হইলেও ডাঃ গোল্ডষ্টুকর অতিশয় সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কাছে ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদ ছিল না। বদান্যতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। সহজেই গোল্ডষ্টুকরের ধৈর্যচ্যুতি হইত এবং অন্যায়কারীকে তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতেন। এই দোষের জন্য গোল্ডষ্টুকরের প্রতি কেহ বিদ্বেষ পোষণ করিত না, সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। এই নিঃস্বার্থপর, উদারহৃদয়, আত্মভোলা পণ্ডিতের শিশু-সুলভ ক্রোধ ও ধৈর্যচ্যুতি পরিচিতদের মধ্যে কৌতুকের বিষয় ছিল। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ইংল্যাণ্ড প্রবাসকালের ডায়েরীতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এক ভোজসভায় তাঁহার সহিত গোল্ডষ্টুকরের সাক্ষাতের উল্লেখ আছে। গোল্ডষ্টুকরের মধ্যেই কেশবচন্দ্র আমাদের দেশের 'ভট্টাচার্যদেরই প্রতিরূপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। গোল্ডষ্টুকরের সারল্য, বেশভূষার উদাসীনতা ও শিশু-সুলভ-ক্রোধই সম্ভবতঃ কেশবচন্দ্রের উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশের উৎস।

লণ্ডন নগরীর সেণ্ট জর্জ স্কোয়ারে ডাঃ গোল্ডষ্টুকরের "প্রিমরোজহল" গৃহটি শুধু অধ্যাপকের ছাত্র, সতীর্থদের নহে লণ্ডন নগরীর তাবৎ বিদগ্ধজনের প্রিয় আশ্রয় কেন্দ্র ছিল। লণ্ডনে ভারতীয় কেহ আসিলেই গোল্ডষ্টুকরের আতিথ্য ও সাহায্য তাঁহার পক্ষে নিশ্চিত ছিল। গোল্ডষ্টুকর নিজেকে লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের অভিভাবক বলিয়া মনে করিতেন—ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসের বংশধর ভারতীয় ছাত্রদের সর্ববিধ সাহায্য দান তিনি অবশ্য করণীয় কর্তব্য জ্ঞান করিতেন। ভারতীয় ছাত্রেরা বিদেশ বাসকালে তাঁহার পিতৃবৎ স্নেহ ও সহায়তায় অভিষিক্ত হইত। কোন ছাত্রের কোন দোষ ত্রুটি দেখিলে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেন ও ছাত্রটিকে রূঢ়-

ভাষায় তিরস্কার করিতেন। ছাত্রেরা অপ্রিয়ভাষণের জন্য দুঃখিত না হইয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করিত।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ছাত্রাবস্থায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ গোল্ডষ্টুকরের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। সুরেন্দ্রনাথের রচিত "এ নেশন ইন মেকিং" গ্রন্থে সাধারণভাবে ছাত্রদের ও তাঁহার প্রতি গোল্ডষ্টুকরের অভিভাবকসুলভ ব্যবহার ও অন্যদিকে অন্তঃস্রাবী স্নেহ ও সহৃদয় আচরণ ও অন্যান্য বহুগুণাবলীর উল্লেখ আছে। ডাঃ গোল্ডষ্টুকরের সহিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখা করিতে না আসায় গোল্ডষ্টুকর সুরেন্দ্রনাথকে একবার সময়ের মূল্য সম্বন্ধে রূঢ়ভাষায় সচেতন করিয়া দেন। সুরেন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি সেইদিন হইতে 'পাঙ্চুয়ালিটি' শিক্ষা করেন। সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তও লণ্ডনে ডাঃ গোল্ডষ্টুকরের নিকট সংস্কৃত পাঠ করেন। উত্তরজীবনে রমেশচন্দ্র ঋগ্বেদের অনুবাদক ও ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গুরু গোল্ডষ্টুকরের জ্ঞান সাধনা নিঃসন্দেহে রমেশচন্দ্রের সাহিত্য ও জীবন সাধনাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ছাত্রাবস্থায় ইংল্যাণ্ড প্রবাসকালে রমেশচন্দ্র গোল্ডষ্টুকর প্রসঙ্গে তাঁহার ভ্রাতার নিকট লিখিয়াছিলেন "এই সদাশয় ব্যক্তি একজন জার্মানদেশীয় মহাপণ্ডিত। আমরা কলেজে তাঁহার কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করি। তাঁহার কাছে অন্য সময়েও উপদেশ লই। ইনি কিছু উদ্‌ভ্রান্ত ভাবাপন্ন হইলেও অগাধ পাণ্ডিত্য, অকপট সহৃদয়তা ইত্যাদি সদ্‌গুণে ভূষিত, যথার্থ মহৎচরিত্র ইহাঁর মধ্যে মূর্ত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হন তাঁহাদের নিকট ইনি সাতিশয় সমাদর ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পাত্র" (লাইফ অফ আর-সি-দত্ত,—জে. এন. গুপ্ত)।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে লণ্ডন প্রবাসকালে ডাঃ গোল্ডষ্টুকরের সহিত পরিচিত হন। ডাঃ গোল্ডষ্টুকর মধুসূদনের পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার অবৈতনিক অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। নিদারুণ দারিদ্র্য-পীড়িত মধুসূদন এই অবৈতনিক পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই কিন্তু গোল্ডষ্টুকরের সহৃদয়তা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করে। যে মধুসূদনকে সবেতন অধ্যাপক পদে নিয়োগ গোল্ডষ্টুকরের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, স্বয়ং গোল্ডষ্টুকরও অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন, ব্যক্তিগত আয় হইতে তিনি জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ১৭ই জানুয়ারী (১৮৬৬) লণ্ডন হইতে মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক পত্র লেখেন। গোল্ডষ্টুকর সম্বন্ধে তিনি লেখেন "দি ডক্টর ইজ্ এ প্রোফাউণ্ড স্যান্সক্রিট্ স্কলার এণ্ড লাভস্ অল্ হিণ্ডুস।" (মধুস্মৃতি ঃ নগেন্দ্রনাথ সোম)

গোল্ডষ্টুকরের অগাধ পাণ্ডিত্য—বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত মধুসূদনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ৮৭ সংখ্যক নিম্নলিখিত কবিতায় তিনি গোল্ডষ্টুকরের স্মৃতিকে অন্ততঃ বঙ্গভাষাভাষিদের নিকট অমরত্ব দান করিয়া গিয়াছেন ঃ

"পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর
মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত রস, তুমি শুভক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃত বিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে!
পণ্ডিত কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত কাননে,

সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?
বাজায়ে সুফল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে;
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরিজাত স্রোতঃ সম ভীম ধ্বনি করে!
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি!
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে?"

জ্ঞানতপস্বী গোল্ডষ্টুকর নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। অবিরত গুরু পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া পড়ে। প্রৌঢ়াবস্থাতেই তাঁহাকে বৃদ্ধের মত দেখাইত। একটি বৃদ্ধা পরিচালিকা তাঁহার দেখা শুনা করিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমেই গোল্ডষ্টুকর ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হন, রোগের সূত্রপাত হইলে তিনি চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই, বা কাহাকেও অসুস্থতার কথা জানান নাই। অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া বন্ধুরা যখন চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন তখন রোগ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখে লণ্ডন শহরে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত প্রচারিত হইল "পণ্ডিত কুলের পতি তুমি এ লণ্ডনে" ডাঃ থিওডোর গোল্ডষ্টুকর আর ইহজগতে নাই।

অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোতে মূলধন

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অন্যতম পরিচয় হ'ল সেই দেশের মূলধনের স্বল্পতা এবং নিকৃষ্টতা। এসব দেশ কোন রকমে বেঁচে থাকবার পক্ষে যথেষ্ট এই মাত্রায় উৎপাদন পরিচালিত হয় বলে সঞ্চয় গড়ে ওঠেনা। বিনিময়গত বা মুদ্রাগত লেনদেনের অস্তিত্ব খুবই সামান্য এই কারণেই। তার ফলে ব্যয় অপেক্ষা অধিক উপার্জন, যা থেকে সঞ্চয় গড়ে তোলা সম্ভব—তা ঘটে ওঠেনা। ফলে পরিমাণগত ও গুণগত ভাবে মূলধন যা গড়ে ওঠে তা প্রয়োজনের তুলনায় যেমন সামান্য তেমনি নিকৃষ্ট।

উন্নত-অর্থনৈতিক-কাঠামোতে যেসকল উন্নত ধরনের মূলধন ব্যবহৃত (যেমন, উন্নত যান-বাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা; যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি) হয়ে থাকে, সেই ধরনের কোন মূলধনের সাহায্যে এসকল অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়না—সম্ভবও না। তাই উৎপাদন হার অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোতে স্বল্প। (এই অবস্থা থেকেই "একটা দেশ দরিদ্র কারণ তা দরিদ্র" এই ভিসিয়ান্ চক্রের উদ্ভব ঘটেছে—এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হয়েছে) একটি উদাহরণ দিই, ১৯৩৭ সালের একটি হিসাবে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু ৭০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয় অথচ সেক্ষেত্রে অনুন্নত অর্থনীতির দেশ ভারতবর্ষে ১০০, মিশরে ৮০, চীনদেশে ৩০ কিলোওয়াট শক্তি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, উন্নত যান-বাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক বিচার করলে এইসব অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলো কত পিছিয়ে রয়েছে—তা ধরা পড়ে। শিল্পোন্নতির সাথে যোগাযোগ—যানবাহন ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। কাঁচামাল আনা-নেওয়া, আভ্যন্তরীণ বাজার প্রসার, বৈদেশিক ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের দিক থেকেই এর গুরুত্ব। নাইজিরিয়ার ১৯৫০ সালের একটি হিসাবে পাওয়া যায়, ৩৫০,০০০ বর্গমাইলের একটি দেশে মাত্র ২০০০ মাইল রেলপথ রয়েছে আর রয়েছে ১১০০০ বাণিজ্যিক যানবাহন, যাদের প্রায় অর্ধেকই ১০ বৎসরের বেশী পুরনো।

অনুন্নত দেশের মূলধনের নিকৃষ্টতা ও স্বল্পতার দরুন চলতি ব্যবহৃত মূলধনের অর্থনৈতিক সুবিধে অনেকটা নষ্ট হয়। এই মূলধনের অনেকটাই খামার ও তার উন্নতি এবং স্থায়ী ভোগ্য পণ্যের আকারে রয়েছে। আর তাও ব্যক্তিগত ও ভৌগলিক দিক দিয়ে ব্যবহার সীমিত। আবার বাজারের সীমাবদ্ধতা ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলেও মূলধনের ব্যবহারের উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না।

বিশেষ কোন সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণীর হাতে কোন মূলধন থাকলে তা অন্য বিশেষ কোন কাজে বা অপর কোন গোষ্ঠী বা শ্রেণীর দ্বারা তার ব্যবহার ঘটতে নাও দেওয়া হতে পারে এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। ভারতে জাতিভেদ প্রথা থেকে অতীতে এই ধরণের সমস্যার উদ্ভূত হবার কারণ আমরা জানি। আবার পূর্ব আফ্রিকায় এখনও দেখা যায়, সেই দেশে এমন আইন প্রচলিত রয়েছে যার ফলে কোন আফ্রিদি নন এমন কোন ব্যক্তির কোন আফ্রিদিকে দেওয়া ঋণ আদায় করা খুবই কষ্টকর কাজেই এইসব এলাকায় সঞ্চয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আফ্রিদি নন এমন ব্যক্তিদের মূলধন আফ্রিকাবাসীদের কলকারখানায় সরবরাহ ঘটে না। আমেরিকায়

শাদাকালোর বিবাদের ব্যাপারেও এই ধরণের অস্পৃশ্যতাও রয়েছে। তবে উন্নত দেশ আমেরিকার বেলায় এ ব্যবস্থা তেমন সমস্যার সৃষ্টি করে না।

একথা বোধহয় অল্পবিস্তর সবারই জানা, নিম্নমানের মূলধনের ফল নিম্নমানের উৎপাদন আর যার জন্য ঘটে, মাথাপিছু নিম্নমানের ভোগ। উন্নত ধরণের যানবাহন ব্যবস্থা এবং ভাল পথঘাটের অভাবেও এইসব দেশে অঞ্চল অনুযায়ী প্রয়োজনের ভিত্তিতে পণ্য নেওয়া দেওয়ার ভিতর দিয়ে সঞ্চয় গড়ে উঠতে পারে না। তারপর যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এর ব্যবহারে খরচ বেশী পড়ে বলে ক্ষণস্থায়ী উন্নত ধরণের ভোগ্য পণ্যের সরবরাহও সীমিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, চলতি মূলধনের স্বল্পতাও মজুত করে রাখার সুযোগের অভাবের দরুন কোন শস্যের হানি ঘটলে চরম অভাবের সৃষ্টি হয়—মজুতশস্য নেই বলে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রাচুর্যের দরুণ এই সময় সরবরাহের স্বাভাবিকমান বজায় রাখা গেলনা।

তাই দেখা যায়, অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রথম পর্যায়ে যোগাযোগ যানবাহন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে থাকে। বলেছি অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি পরিচয় হল, স্বল্প ও নিকৃষ্ট ধরণের মূলধন এবং মূলধন গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল অবস্থার অভাব। আরও একটি পরিচয়, এইসব দেশের অর্থনীতিতে ক্রমিক দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের অস্তিত্ব—কারণ প্রাচীন উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমবর্দ্ধমান জনসাধারণের প্রয়োজন সাধনে অক্ষমতা। তাই যদি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাবিহীন অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটে তবে সমস্যার সমাধান ঘটে ধাপে ধাপে অনুন্নত অর্থনীতিতে। তবে পরিকল্পনামূলক অর্থনীতিতে যদি পরিকল্পনায় ও তার রূপায়ণে এটি থেকে থাকে তা হলেও এই সমস্যা আকাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে সমাধান সম্ভব না। ভারতবর্ষে দেখি, পরিকল্পনার সাহায্যে কিছু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটার ফলে পল্লী ও সহর এলাকায় যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার হওয়ায় আজকের দিনেব খাদ্যাভাব আগের দিনের খাদ্যাভাবের মত তীব্র হয়ে দেখা দেয়নি। অবশ্য যোগাযোগ যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি ছাড়াও আরও একটা কথা আছে—তা হল রাজনৈতিক ক্ষমতা বা দলের কথা। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে সরকারের দায়িত্ব ও মমত্ব বোধ বেড়েছে—সেইজন্য পৃথিবীর যেখান থেকে পাওয়া যায় সেখান থেকেই ধারকর্জ করে দেশের খাদ্যাভাব ঘোচাবার চেষ্টা চলেছে—কিন্তু এটা সঠিক পথ নয়। অর্থাৎ বলতে চাইছি, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে, তাই বা বলি কেন, নেহাৎ প্রয়োজনীয় জাতীয় মূলধন গড়ে ওঠেনি। পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় কিছু বেড়েছে—মূলধন যা বেড়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় উল্লেখযোগ্য নয়। তার ফলে অর্থ-নৈতিক সঙ্কট আরও বেড়েছে। মুদ্রাস্ফীতি, ঘটেছে রপ্তানীর চেয়ে ভোগ্যপণ্যের আমদানী (আন্তর্জাতিক জীবনমানের প্রভাবে) বেড়েছে যার ফলে মূলধন সঞ্চয় গড়ে উঠল না।

একটা কথা আমাদের জানা রয়েছে—মূলধনের স্বল্পতার দরুণ বাজারে সুদের হার চড়া থাকে—ফলে যারা ঋণ দেয় এবং যারা ঋণ নেয় উভয় পক্ষেই চেষ্টা করে যাতে ঋণের ব্যবহারটা সবচেয়ে সুবিধাজনক ভাবে করা যায়। এই মূলধনের স্বল্পতা এবং উঁচুহার সুদের ফলে ল্যাম্প ও নাইজিরিয়ার পশ্চিম প্রদেশগুলিতে গোল্ডকাস্টিং নামে খ্যাত একটি রীতি প্রচলিত আছে। এদেশে বড় বড় আমদানী কারবারে সুপ্রতিষ্ঠিত মক্কেলদের একদলকে বলা হয় গোল্ডকাস্টার। সেমাসের প্রথম বাজারে চাহিদামত ভাল পণ্য বাকীতে, ধরা যাক. ১৩০ পাউন্ডের চুরুট কেনে এবং পরমুহূর্তেই তা ১৭৮ পাউন্ডে বিক্রি করে দেয়। কিন্তু এর ফলে তার যে নগদ টাকা হাতে এল তা দিয়েআরও লাভজনক কোন ব্যবসা অথবা মহাজনী কারবার করে। সেখানে দেখা গেছে, একহাটের দিন থেকে আরেক হাটের দিনের পাঁচদিনের ব্যবধানে অনেক বেশী সুদে ধার দেওয়া

চলে। এই করে মাসের শেষে তার চুরুটের দামও শোধ হল। তাছাড়া স্থানীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মেও অনেক সাহায্য হল। কোন কোন এলাকায় এই ধরণের রীতি প্রচলিত রয়েছে।

একথা তো বলাই হয়েছে, চাহিদার তুলনায় মূলধনের স্বল্পতার ফলে অনুন্নত দেশগুলিতে সুদের হার চড়া থাকে। এছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অবস্থার ফলে সুদের হার চড়া থাকে। যেমন, মানুষের নগদ পছন্দ, সুদ বাকি পড়ার ঝুঁকি এবং স্বল্প ঋণ দেওয়ার অধিকতর খরচের ফলেও সুদের হার চড়া হয়ে থাকে। তাছাড়া এসব দেশের কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণের একচেটিয়া কারবারীরা তাদের একচেটিয়া মুনাফা লাভের চেষ্টার ফলেও ঋণ বাড়ে। ভারতবর্ষের গ্রামের দিকে দৃষ্টি দিলে কথাটার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকে না। আবার দেখা গেছে; যারা ঋণ নিয়েছে তারা তাদের পণ্য ঋণদাতার কাছে বাজারের প্রচলিত দামের চেয়ে সস্তাদরে দিতে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রেও ধার্য্য সুদের হার প্রদত্ত প্রকৃত সুদের হারের চেয়ে কম বলেই বোধ হবে।

ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে যে একচেটিয়া কারবারের কথা উল্লেখ করেছি তা কিন্তু উঁচুহার সুদের জন্য কিংবা ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত মূলধনের অধিক উৎপাদনে ক্ষমতার জন্য অথবা জামিন হিসাবে দেওয়া জমির উপর প্রায়ই অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগের জন্য অথবা ঋণদাতার কাছে সস্তায় ফসল বিক্রি করে দেওয়ার সর্তের জন্য ঘটে থাকেনা।

মূলধন ও উৎপাদন পদ্ধতি

উৎপাদনের ও উপাদান সরবরাহের ব্যাপারে অসমতার দরুণ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং সংগঠন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। একথা বোধহয় সহজেই বোধগম্য, মূলধন এবং শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে যদি মূল্যগত পার্থক্য থাকে তবে সংগঠকের উপাদান ব্যবহারের সিদ্ধান্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে, কেননা, তারা তো সুবিধামত অর্থাৎ যাতে উৎপাদন খরচা কম পড়ে সেইদিকেই সব সময় দৃষ্টি দেবে। অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারি, উন্নত দেশের মূলধন শ্রমের পারস্পরিক খরচের তুলনায় অনুন্নত দেশে মূলধনের স্বল্পতাজনিত মূলধনের খরচা শ্রমের চেয়ে বেশী।

এই কারণেই উপাদানগত অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার বিভিন্নতার দরুণ বিভিন্ন দেশে ক্ষেত-খামারের, কলকারখানায় বা বেচাকেনার ক্ষেত্রে উপাদান নিয়োগের পদ্ধতি ভিন্ন। যেমন যেদেশে প্রকৃত মজুরীর হার খুব বেশী এবং সুদের হার স্বল্প সে সব দেশে মূলধনাশ্রয়ী পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে, যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যের দেশগুলি। এই পদ্ধতি কিন্তু ভারতবর্ষ প্রভৃতি অনুন্নতদেশগুলিতে যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা বেশী; মজুরী কম এবং মূলধন স্বল্প ও সুদের হার বেশী সেক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবেনা। এই শেষোক্ত দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হয়ে যখন মূলধন সঞ্চয়ের মান বৃদ্ধি পাবে তখনই উপরোক্তদেশের পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবে অনুসৃত হবে, কেননা তখন ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগানের অভাব ঘটবে, ফলে প্রকৃত মজুরী যাবে বেড়ে এবং শিল্পায়নের ফলে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকের সঞ্চয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে—তাতে মূলধনের যোগান বেড়ে গিয়ে সুদের হার কমবে। অর্থনৈতিক দক্ষতা প্রাপ্তব্য সম্পদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধামত ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল।

আমরা জানি, আমাদের মত অনুন্নত অনেক দেশে এমন অনেক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম ঘটে যার জন্য কোন মূলধন লাগেনা আর লাগলেও খুবই সামান্য। অথচ সেই ধরণের ক্রিয়াকর্মে উন্নত দেশে বিপুল শ্রমের পরিবর্ত্তে বিপুল মূলধন ব্যবহৃত হচ্ছে। একেবারে ঘরোয়া কথাতেই আসা যাক—আমাদের দেশের গ্রাম ও সহর এলাকাতে ঘরের কাজের জন্য ব্যবহৃত জল বাড়ির বৌঝিরাই প্রকৃতির ঝর্ণা, নদী অথবা পুকুর বা বারোয়ারী কূপ থেকে কাঁখে করে মাটির কলসে বয়ে আনে। বিলেত

ন্যায়কের মত দেশগুলিতে এই ব্যাপারে ব্যাপক মূলধনের ব্যবহারের সাহায্যে এই অভাবগুলি মেটান হচ্ছে। আমাদের সহর এলাকাতেও আবিশ্যি এই পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। কেননা সহর এলাকায় মূলধন তুলনায় বেশী এবং মজুরীও বেশী। আমাদের গ্রাম এলাকায় এবং কিছু কিছু সহর এলাকাতেও বাসগৃহ তৈয়ারী হচ্ছে প্রকৃতি প্রদত্ত উপাদান থেকে—কাদামাটি খড় দিয়ে এবং সেগুলি স্বল্পকাল স্থায়ী আর তাই সেগুলিকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে বেশ কিছু শ্রম নিয়োগ করতে হচ্ছে এখানে শ্রম তো সস্তা।

দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক অবস্থার অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে, সেখানে মেয়েদের সময়ের প্রায় একতৃতীয়াংশই ঘরের কাজ, জল আনা, জ্বালানি সংগ্রহ করা, হাত দিয়ে গম পেষা এবং বাসঘরের দেয়াল, চাল এবং মেজে ঠিক রাখার কাজেই ব্যয়িত হয়। ভারতবর্ষের বেলাতেও একথা সম্পূর্ণ খাটে। আমাদের মত অনুন্নত দেশগুলিতে যেখানে ক্ষেতে খামারের কাজের অনেকটাই ঘরের মেয়েদের করতে হয় সেখানে দেখা যায়, উপরিউক্ত কাজকর্মের দরুণ তারা ক্ষেত-খামারে চাষবাসের কাজে সামান্য সময়ই দিতে পারে। ডি, এইচ হফটোন এবং ই এম, ওয়াল্টেন এর হিসাব মত মেয়েদের সময়ের মাত্র শতকরা দশভাগ ক্ষেতে খামারের কাজে ব্যয় হয়।

আমাদের মত দেশগুলিতে পরিবহনের কাজ কুলি পোর্টাররা করে থাকে কোনপ্রকার মূলধন যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে গরুর গাড়ী ঠেলাগাড়ী অথবা মানুষটানা রিক্সার সাহায্যে নেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য আজকাল অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে কিছু কিছু সাইকেল ও সাইকেল রিক্সর ব্যবহার প্রচলন হয়েছে।

মূলধন যন্ত্রপাতির অভাবের দেশে অনুন্নত অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট হল, এখানকার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মগুলি প্রধানতই সংগ্রহকরা ও বহনকরার কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর যে সহজ উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাতে এই সংগ্রহকরা বহন করার কাজই প্রধান।

একথা সবার জানাই, অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে চাষবাসের শ্রমবহুল পদ্ধতি প্রচলিত। মূলধনের অভাবের ফলে চাষবাসের কাজে খুবই ক্ষতি হয়, কেননা প্রয়োজন মত উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি, সার কৃষকরা ক্রয় করতে পারেনা। ফলে উণ-আদমনীতি সক্রিয় থাকে। আরও একটা কথা—এসব দেশে যখন বীজ বোনা থেকে ফসল ঘরে তোলার মধ্যে ৬ মাস আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দু-তিন বছরও লাগে (যেমন আম কাঁঠাল ফসলের গাছের চাষ) সেখানে উপবৃত্তির অভাবের দরুণ তাদের উপার্জনের কোন অংশই অন্য কোন চাষবাসের জন্য অথবা যন্ত্রপাতির ক্রয়ের কাজে ব্যবহার করতে চায়না। আবার শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও শ্রমবহুলতা যে অত্যন্ত বেশী তাও আমরা যারা ধাতু বা লৌহকারখানার কাছে থাকি সেখানকার হৈ চৈ হল্লোর থেকে উপলব্ধি করতে পারি।

আবার পণ্যের বাজারও মূলধনের স্বল্পতা এবং শ্রমের প্রাচুর্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এসব দেশের মানুষের কিংবা ক্রেতার কিংবা উৎপাদনকারীর মজুত করে রাখবার জায়গার স্বল্পতা এবং চলতি মূলধনের অভাবের দরুণ বারেবারে অল্প পরিমাণের পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধনের অভাব শ্রম দিয়ে মেটাবার চেষ্টা চলে। অনুন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা চলতি মূলধনের অভাব এবং মজুত করে রাখার ব্যবস্থার অভাবে বাজার দরও বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়—যার ফলে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরণের বাজার দর প্রচলিত থাকে। আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শ্রমের প্রাচুর্যের দরুণ এবং মূলধনের অভাবের ফলে পুরাতন বহু ব্যবহৃত মূলধনকেই শ্রমের সাহায্যে আরও বহুদিন টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা চলে এসব দেশে এবং এই মূলধনের এমন শোচনীয় অবস্থাতেও এদেশে ব্যবহারের চেষ্টা চলে যার বহু পূর্বে উন্নত অর্থনীতিতে বাতিল

হয়ে যেত। এ প্রসঙ্গে উন্নত অর্থনীতি থেকে অনুন্নত দেশে ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি অর্থাৎ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি রপ্তানীর ব্যাপকতার দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা চলতে পারে।

আবার লরী, রাবার টায়ার, পেট্রলক্যান প্রভৃতির ব্যবহার এসব দেশে চরম পর্য্যায়ে পৌঁছয় এবং তখনও এসবের রেহাই নেই—জোরা তালি দিয়ে, বারবার মেরামত করে এগুলি চালু রাখবার চেষ্টা চলে অবশ্য আরও একটা কথা এখানে স্মরণ রাখতে হবে, এইসব অনুন্নত দেশগুলিতে লরী প্রভৃতি চালাবার ও যন্ত্রপাতি সারাবার ব্যাপারে কারীগরী জ্ঞানের অভাবের ফলেও এবং রাস্তাঘাট বেশীর ভাগই খারাপ থাকায় এইসব মূলধনজাত সম্পদগুলির স্বাভাবিক আয়ু উন্নত দেশগুলির তুলনায় দ্রুত হ্রাস পায়। প্রায়ই দেখা যায়, মোটর গাড়ীর চাকার টায়ারগুলি বারবার করে সারাতে সারাতে যখন আর গাড়ীর টায়ার হিসাবে ব্যবহারযোগ্য থাকেনা তখন সেই টায়ার দিয়ে এসব দেশে জুতোর সোল বা অন্য কোন জিনিষ তৈরী হয়। অর্থাৎ সস্তা শ্রমের প্রাচর্য্যের ফলে নিম্ন-মান মূলধনের ব্যবহারকে দীর্ঘায়িত করা হয় এর ফলে লোকের উপার্জন বাড়েনা—বাজার প্রসারিতও হয়না।

একথা শোনা যায়, পারস্যের বিভিন্ন এলাকায় যেসব টিনে করে পেট্রল সরবরাহ করা হয় সেগুলিকে পরে বিভিন্ন ধরণের কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন, পিটিয়ে ট্রে করে কিংবা জল দেওয়ার ক্যান হিসাবে অথবা ড্রেনের পাইপ বা জানলার পাল্লা হিসাবে।

আমাদের দেশেও অন্যকাজে ব্যবহৃত খালি শিশি, বোতল, কৌটো টিনের বেশ ব্যপক ব্যবসা গড়ে উঠেছে—এই সব পুরনো খালি শিশি, বোতল, কৌটো প্রভৃতিকে পরে জিনিষপত্র মজুত রাখা, চালান দেওয়া বা অন্য কোন প্রায় স্থায়ী পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এইসব পুরনো শিশি বোতল কৌটোর ব্যবসায়ীরা অর্থাৎ মেয়েরা ও ছোট ছেলেরা, যাদের আমাদের দেশের পথেঘাটে চোখে পড়ে, তারা এই সব পণ্যের মূলধন মজুত রাখে— লক্ষ্য রাখে, যাতে এগুলি নষ্ট হয়ে না যায়, ভাঙ্গাচোড়া থাকলে সেগুলি সারিয়ে রাখে এবং শেষে চালান দেয় সেইসব ক্ষেত্রে ও শিল্পকর্মে যেখানে এগুলির সদ্ব্যবহার হবে। এমন করে এইসব জিনিষের প্রয়োজনীয়তা এবং আয়ু দীর্ঘায়িত করা হয়। অর্থাৎ মূলধনের পরিবর্তে অধিকতর শ্রম ব্যবহার করা হল। যেহেতু এই সব ব্যবসায়ে নিযুক্ত স্ত্রী ও বালকদের করার অন্য কোন বিকল্প কাজ নেই—কাজেই বসে থাকার চেয়ে এই ধরণের ৭।৮ ঘন্টার কাজের মধ্যে যে সামান্য মুনাফা লাভ হয় তাই-ই এই ধরণের মূলধনের পরিবর্তে শ্রমের নিয়োগ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধাজনক।

এছাড়াও এসব দেশে প্রকৃতি প্রদত্ত অনেক উপাদান উন্নত অর্থনীতির অধিক মূলধন ব্যবহৃত (ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ) উৎপাদন পদ্ধতির পণ্যের প্রয়োজন মেটায়। এই সমস্ত প্রকৃতি প্রদত্ত উপাদানগুলিকে দক্ষতার সংগে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। মিঃ রিচার্ড উত্তর রোডেসিয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন, সেখানে গাছপালাগুলি কেবলমাত্র সেখানকার অধিবাসীদের খাদ্যের সূত্রই ছিলনা—এই গাছগুলিকে তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক পণ্যের অভাবই মেটাবার কাজে ব্যবহার করা হত। যেমন কুড়েঘর, শস্য ভাণ্ডার, ক্ষেতখামার ঘিরে রাখবার বাগান ও দেওয়াল চৌকি, বসবার টুল অর্থাৎ পল্লী এলাকার প্রয়োজনীয় প্রায় সব আসবাবপত্রই এই বৃক্ষ থেকে তৈয়ারী করা হত।। আবার গাছের ছাল দিয়ে দড়ি বানিয়ে জাল তৈরী হত। আমাদের দেশেও পল্লী-গ্রামের অর্থনীতি প্রসঙ্গে উপরের বর্ণনা বোধহয় অক্ষরে অক্ষরেই খাটে। নারকেল গাছ বা আজ কাঁঠাল গাছের বিভিন্ন দিক দিয়ে উপকারিতার কথা কি আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে?

অর্থাৎ কৃষি ও যন্ত্রশিল্প কলকারখানার ক্ষেত্রে উৎপাদন সামান্য এবং এই উৎপাদন সামান্য বলে জাতীয় আয় কম।

অর্থনৈতিক ও যন্ত্রপাতির দিক দিয়ে অনেক উন্নতদেশগুলি সুরুতে আজকের দিনের অনুন্নত দেশগুলির অবস্থাতেই ছিল।। সেই সব দেশেও সেদিন অর্থনৈতিক পরিবর্তন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সামান্য পরিমাণ মূলধন হয়ত গড়ে ওঠে—তার ফলে এই ভিসিয়াস চক্রটিতে ভাগ্গন ধরে। আজকের দিনের অবস্থা স্বতন্ত্র। পৃথিবীর কিছু দেশ অর্থনীতির দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নত, তাদের উৎপাদন পদ্ধতি, তাদের ভোগ-কাঠামো তাদের জীবনমান অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় অচিন্তনীয় রকম উন্নত। এই অনুন্নত দেশগুলিকে তাই যদি দ্রুত উন্নত দেশগুলির পর্য্যায়ে উঠতে হয় তবে সরকারী উদ্যোগে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাহায্যে সঞ্চয় গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে মূলধন সংগঠন করতে হবে। আর তাতে এই চক্রে ছেদ পড়বে। আবার বিদেশী মূলধনের সাহায্য নিয়েও এই চক্রে ভাগ্গন ধরান যায়। অবশ্য এই ভাবে অগ্রসর হবার আগে দেশের অর্থনৈতিক ফলপ্রসূতার একটা মোটামুটি খোঁজ খবর নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমেই চোখে পড়ে অনুন্নত অর্থনীতির দেশগুলিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও নিয়োগ অনেক বাধা রয়েছে। ঐসব দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, আইনানুনের দিকদিয়ে নিরাপত্তার অভাব (এ প্রসঙ্গে মধ্যপূর্ব প্রাচ্যের দেশগুলি—পাকিস্থান, সুদূর পূর্ব ও দঃ পূঃ এশিয়ার দেশগুলি এবং দক্ষিণ আমেরিকার কতকগুলি দেশের উল্লেখ করতে পারি।) মুদ্রাগত বিধি ব্যবস্থার অস্থিরতা, প্রচলিত বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার প্রথার ফলে সম্পদের অপব্যবহার, ছদ্ম ও অর্ধবেকারের প্রশ্রয়তা এবং উদ্যমহীনতা এসব কিছুই ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পক্ষে মারাত্মক রকম প্রতিবন্ধক। এছাড়া বিশেষ ধরণের ভূমিব্যবস্থার (যেমন ভারত ও পাকিস্থানের জমিদারীপ্রথা) ফলে সঞ্চয় ও তার বিনিয়োগ যন্ত্রশিল্পমুখী হয়নি—জমি-মুখী হয়েছে। এই সব ব্যবস্থার দরুণ মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতা অদূর ভবিষ্যতকে ছড়িয়ে যেতে পারেনি—যা বর্তমানের ভোগপ্রবণতাকে দমিয়ে ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য সঞ্চয়কে উৎসাহিত করে। ফলে এসব দেশে যাদের উদ্বৃত্ত আয় থাকে তারা বিলাস ব্যসনেই সেই উপার্জনকে উড়িয়ে দেয় এর ওপর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ফলেও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও এসব দেশের ভোগপ্রবণতাকে কম প্রভাবিত করেনি। ফলে সঞ্চয় ঘটে ওঠেনা, সম্ভবই হয় না। যাও ঘটে তাও জমিতে ঝুঁকি বিহিন বিনিয়োগেই সীমাবদ্ধ থাকে ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহ ঘটেনা।

তবে ক্রমশই যখন সঞ্চয়ের ও মূলধন ব্যবহারের পক্ষে সাধারণ বাধা-অসুবিধা দূর হয়ে যায়, এবং মূলধনের লাভজনক ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয় তখন ব্যক্তিগত মূলধন গড়ে ওঠে, অনুকূল অর্থনৈতিক আবহাওয়ায় অনেক সাধারণ মানুষই সঞ্চয়ের দিকে মন দেয়। গ্রেগরী কিং ১৭ শতকের ইংলণ্ডের কথা লিখতে গিয়ে লিখছেন, 'যদিও সেদিন ভূস্বামী এবং বড় বড় সদাগর ব্যবসায়ীরা একক ভাবে সবচেয়ে বড় সঞ্চয়ী ছিল, তথাপি সেদিনের (১৬৮৮ খৃঃ) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সর্ববৃহৎ অংশ, মিতব্যয়ী কৃষক ও খামার মালিকেরা, সঞ্চয়ের বৃহৎ অংশের অবদান ছিল তাদের।' শুধু তাই নয় আইন ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী, দোকানদার কারবারী, বণিক সম্প্রদায় এমনকি, কারিগর ও শিল্পীরাও তাদের যথাসাধ্য সঞ্চয় করেছে। লকউড্ সাহেব তাঁর 'দি ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট অব জাপান বইতে লিখেছেন— ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর অসংখ্য লোকের সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা থেকেই মূলধন গড়ে উঠেছে এবং বাজার প্রসার ও সঞ্চয় বিনিয়োগের পক্ষে উৎসাহজনক অবস্থার সৃষ্টির সাথে সাথে এ সঞ্চয়ের গতি বেড়েছে। বিভিন্ন দেশের সঞ্চয় হারে যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায় তার মূলে অন্যতম কারণ হল, শিল্পে উঁচু বিনিয়োগের পক্ষে উৎসাহ।

অনুন্নত অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও মূলধন গড়ে ওঠার পক্ষে যদি অনুকূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আবহাওয়া না থাকে তা হলে বিত্তবান লোক যাদের হাতে উদ্বৃত্ত উপার্জন থাকে

তারা সেই উদ্বৃত্ত আয় সোনা, হীরা, জহরৎ, গহনা এবং বহু মূল্যবান বস্ত্র ও বাসনের আকারে রাখে কেননা দেশে বিপদ আপদের সময় এগুলি সহজেই সরিয়ে ফেলা চলে, কিন্তু যন্ত্রপাতি, বাসগৃহের বেলায় সম্ভব হয়না। শুধু তাই নয়, এইসব দ্রব্যগুলিকে অনায়াসে ক্রয় ক্ষমতাতেই রূপান্তর করা যায়। এবং মুদ্রাস্ফীতির সময় (যা এই সব দেশে মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে) এইগুলি অনেকটা ইন্সুরেন্সের মত কাজ করে। আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয় হল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা শিল্পকারখানার চাইতে বাণিজ্যে টাকা লগ্ন করাতে উৎসাহ দেয়। কেননা বাণিজ্যে লগ্নীকৃত সম্পদশিল্পের চেয়ে অনেক বেশী নগদ পর্যায়ে থাকে। এবং লগ্নীও তুলনায় অনেক স্বল্পমেয়াদী।

যতই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা নিরাপদ হবে, দীর্ঘমেয়াদী লগ্নীর পক্ষে অবস্থা অনুকূল হতে থাকে ততই, এসব দেশে লক্ষ্যকরা গিয়েছে আবাদী চাষে এবং যানবাহন শিল্পে টাকা লগ্নীর দিকে ঝোঁক বেড়েছে। অবস্থার এই উন্নতির ফলে সঞ্চয়ের যে প্রান্তিক মাত্রা বাড়তে থাকে এবং অন্য আকারে থাকার সঞ্চিত সম্পদ শিল্পে ও ব্যবসায় বাণিজ্যে অধিকতর পরিমাণে সরবরাহ হতে থাকে। অনুন্নত অর্থনীতি তো দেখাই যায় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে বণিক সম্প্রদায় ম্যানুফ্যাকচারিং ও যানবাহন শিল্পে টাকা লগ্নি করতে এগিয়ে আসে।

অনেক সময় আমরা দেখে থাকি, অনুন্নত অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত উপার্জনের বিত্তবান মানুষ বিশেষ করে কৃষি এলাকার মর্য্যাদার জন্যেই হোক বা দুর্দিনের জন্যই হোক তাদের সঞ্চয় দিয়ে জমি কেনে। অনেকে মনে করেন, এতে মূলধন গড়ে ওঠে না বরং এতে জমির দাম ও বন্টন প্রভাবিত হয়। কিন্তু এধারণাটা ঠিক নয়। কেননা, যখন বিত্তবান মানুষ তাদের উদ্বৃত্ত আয় ভোগ্যপণ্যেও অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর ভোগবিলাসে (যা অনুন্নত অর্থনীতিতে মূলধন গড়ে ওঠার পক্ষে অন্যতম প্রতিকূল শক্তি) ব্যয় না করে জমিতে লগ্নি করে তখন সেই সম্পর্কে অন্যভাবে ব্যবহারের জন্য অর্থনীতির কাছে যোগান দেওয়া হল। ফলে, সেই মত মূলধন গড়ে ওঠে। তবে একথা সত্যি বিত্তবান মানুষের এই সঞ্চয় শিল্পমুখী হলনা। ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে শিল্পমুখী মূলধন গড়ে না ওঠার একটি বিশিষ্ট কারণ সেদিনের ভারতের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা—তা যেমন ঝুঁকি বিহীন ছিল; তেমনি লাভজনক ছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে অবস্থাটা ঠিক ছিল তার উল্টো। ফলে দেশের সঞ্চয়ের এক বিরাট অংশ জমিতেই লগ্নী হত। তাই পরিকল্পনার সাহায্যে যখন শিল্পায়নের কথা দেশে ভাবা হল তখন ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথাও আমাদের সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হয়েছে। যদিও সেই মর্মে আমরা সঠিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিনি। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে বিঘ্ন ঘটেছে তাতে আজ এবিষয়ে সঠিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে চিন্তা ভাবনা চলছে।

আলোচনা প্রসংগে পূর্বে কোন এক জায়গায়, অনুন্নত অর্থনীতিতে অর্ধবেকার ও ছদ্মবেকারের কথা উল্লেখ করেছি। অনুন্নত অর্থনীতিতে বেকার সমস্যা প্রধানত এই দুই রূপেই প্রকাশিত। অথচ এই ছদ্মবেকার ও অর্ধবেকার অবস্থা এই সব দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পক্ষে উৎপাদনমূলক উৎস। এই সবদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থানুযায়ী, অর্থাৎ কোনও রকমে খেয়ে পড়ে বেচে থাকার অর্থনীতিতে বৃহৎ একান্নবর্তী প্রথার ফলে গোষ্ঠীগতভাবে উৎপাদন ও তার বন্টন ব্যবস্থা প্রচলিত। প্রত্যেক একান্নবর্তী পরিবারের মোট আয় থেকে তার অংশ ভোগ করে যদিও তার অংশ উপার্জনে তার অবদান অনুপাতে বন্টিত হয়না। ভারতবর্ষে হিন্দু একান্নবর্তী পরিবারগুলি এই ধরণের অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মের বৈশিষ্ট্য বহন করে। এখানে সামাজিক বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিবারের অর্ধবেকার ও ছদ্মবেকার ব্যক্তিরা উৎপাদনে তাদের অবদানের বেশী ভোগ করে। অবশ্য এইসব অর্থনীতিতে ভোগের মান, কোনরকমে বেঁচে থাকার উপাদানের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ এই থেকে উৎপাদনে ছদ্মবেকার ও অর্ধবেকারদের অবদানের মূল্য পরিমাপ করা যায়। এমন করে এইসব দেশে উৎপাদনের একটা অন্যতম উপাদান অব্যবহৃত অথবা অর্ধ-ব্যবহৃত থেকে যায়। এই সব দেশের সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ফলে অর্ধ ও প্রচ্ছন্ন বেকার মন উৎপাদনে তাদের অবদানের তুলনায় অধিক ভোগের অধিকারী হয়ে থাকে।

অধ্যাপক বাগনার নার্কসে তাঁর প্রব্লেমস অব ক্যাপিটাল ফরমেশন ইন্‌দি আণ্ডার ডেভেলপ্‌ড কান্টিস বইতে বলতে চেয়েছিলেন যে এই সব অনুন্নত অর্থনীতিতেও আমরা যদি শ্রমবহুল মূলধনী প্রোজেক্টে অর্ধবেকার ও ছদ্মবেকারদের কাজ দিতে পারি তবে এদের এতদিনের অর্থ-নৈতিক সুবিধে বিহীন ভোগকে উৎপাদনমূলক ভোগে রূপান্তর করা চলে।

মূলধন গড়ে তোলার পক্ষে আরও একটা উল্লেখযোগ্য ফলপ্রসূ ব্যবস্থা হল, পথ-ঘাট প্রভৃতি কতকগুলি সম্পদের উন্নতি করা। এর ফলে, ব্যবসায় কারবারী, শিল্পপতিদের ব্যবসায় ও পরিকল্পনার তুলনায় যাতায়াতে মজুত উপাদানে পণ্যের পরিমাণ হ্রাস করতে পারা যায়। তখন এই বাড়তি চলতি মূলধনকে আমরা স্থায়ীমূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে পারি।

অনুন্নত অর্থনীতিতে কতকগুলি সামাজিক রীতি ও বিধি এবং ধর্মীয় অনুশাসন ও মূলধন সঞ্চয়ের পক্ষে বাধা স্বরূপ। যেমন শব-সংস্কারের সাথে মৃতের সম্পদ তা যত মূল্যবানই হোক, ধ্বংস করে ফেলবার শাস্ত্রীয় নির্দেশ রয়েছে—তাছাড়া, ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতেও মূল্যবান সম্পদের এরূপ ব্যবহারের নির্দেশ আছে যা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে মারাত্মক রকম ক্ষতিকর।

এই সুদীর্ঘ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে, অনুন্নত অর্থনীতিতে দারিদ্র রাষ্ট্রনৈতিক অনিশ্চয়তা, বাজারের সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি সঞ্চয়ের পক্ষে মারাত্মক বাধার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, মূলধন গড়ে ওঠার পক্ষে উৎপাদনশীল উৎস যথেষ্ট রয়েছে। একবার অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ সুরু হলেই ঐ উৎসগুলি ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। ফলে 'আমার দেশ দরিদ্র কারণ তা দরিদ্র বলো' যে ভিসিয়াস চক্রটির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা গিয়েছিল—তাতে ভাঙ্গন ধরতে সুরু করে।

এই প্রসঙ্গে অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে মূলধন সঞ্চয়ের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ভোগ-মানের প্রভাব সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন রয়েছে। আধুনিক উন্নত ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা; সংবাদপত্র এবং জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের ফলে, অনুন্নত দেশের লোকেরাও উন্নতদেশের উন্নত ভোগ ও জীবনমান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যেও ক্ষমতা অনুযায়ী ঐ ধরণের ভোগও জীবন মানের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা প্রবল হয়ে ওঠে। এর ফলে অনুন্নত অর্থনীতিতে মূলধন সঞ্চয়ে ব্যাহত হয়। কেননা যে উদ্বৃত্ত আয় এসব দেশের মানুষের থাকে তা তারা সঞ্চয় না করে বিদেশ থেকে আমদানী করেও তাঁদের উন্নত অর্থনীতির জীবন-মানের অনুকরণ স্পৃহা তৃপ্ত করতে চান।

(ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় অবস্থাটা উপলব্ধি করা চলে। তাই সঞ্চয় বাড়াবার জন্য, আমদানী হ্রাসের উদ্দেশ্যে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকল্পেআমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ব্যয়কর (এক্স পেনডিচার কর) ধার্য করা হয়েছে)। আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধির মূলে বিদেশজাত উন্নত ধরণের বিভিন্ন প্রকারের ভোগপণ্যের চাহিদাবৃদ্ধি অন্যতম কারণ। অবশ্য এই চাহিদা বৃদ্ধির পেছনে পরিকল্পনার ফলে আয়বৃদ্ধির প্রভাব রয়েছে। রেডিও, সিনেমা, পত্রপত্রিকাও এদেশে আগত বিদেশীদের জীবনযাত্রা প্রসার কিছু আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর কাজ করেছে। ফলে চলতি আয়ের যে বৃদ্ধি ঘটছে তা এইসব পণ্যের পেছনেই ব্যয় করা হচ্ছে কাজেই সঞ্চয়ের অবস্থা প্রায়

যথাপূর্বং তথাপরং। অধ্যাপক ক্যালডর প্রস্তাবিত ব্যয় করাকে তাই এইদিক থেকে মনে করতে পারে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রতিক্রিয়ার বিরোধী ব্যবস্থা।

আমরা দেখেছি দরিদ্র দেশের 'ভিসিয়াস সার্কেল' সেই দেশের মূলধন সঞ্চয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। নার্কসে বলছেন, কিন্তু তার চেয়েও ক্ষতিকর দুই দেশের মধ্যে দারিদ্র্যের তারতম্য।

আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর প্রতিক্রিয়ার ফলে মূলধন গড়ে ওঠা বাধা প্রাপ্ত হয়—একথা খুবই সত্যি। কিন্তু ব্যাপারটির অন্য দিকটাও দেখবার আছে। আন্তর্জাতিক ভোগ ও জীবন-মানের প্রদর্শনীর যেমন ভোগকাঠামোর উপর প্রতিক্রিয়া আছে তেমনি অন্যদিকেও অর্থাৎ বিনি-য়োগ ও কর্মোদ্যোগের উপরও এই উন্নততর জীবনমানের প্রভাব রয়েছে। প্রথমতঃ এই উন্নততর এবং বিচিত্রতর জীবন ও ভোগ মান লাভ করতে হলে উন্নত দেশের মানুষের মতই সঞ্চয়ী ও শিল্পে বিনিয়োগের প্রতি অধিক নজর দেওয়ার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাও এই সব অনুন্নত দেশের মানুষ অনুকরণ করবে। ফলে, সঞ্চয় বাড়বে এবং মূলধন শিল্পমুখী হবে। এটা নিঃসন্দেহে সুফল। আবার বিদেশের মত উন্নততর ভোগ ও জীবনমানের অধিকারী হতে হলে আয় বাড়াতে হবে—এই তাগিদের ফলে, কৃষি এলাকায় কৃষকরা বাজারে বিনিময়ের জন্য তাদের কোন রকমে বেঁচে থাকার পর্যায়ের চাইতে অধিক উৎপাদনের দিকে নজর দেবে। অথবা কোনরকমে বেঁচে থাকা পর্যায়ে উৎপাদনের পরিবর্তে অন্য কোন উৎপাদনের ব্যাপারে সচেষ্ট হবে যাতে বিনিময়ের জন্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হতে পারে। এইভাবেই অনুন্নতদেশের অর্থনীতিতে বাজার অর্থনীতি বা বিনিময় অর্থনীতির প্রসার ঘটে। উন্নত দেশগুলিতেও অতীতে এমন ধারাই ঘটেছে। কৃষি সম্পদেও উৎ-পাদনের উন্নতিও প্রসারের মধ্যে দিয়ে মূলধন সৃষ্টিই এই বাজার অর্থনীতি বা বিনিময় বা মুদ্রা-গত অর্থনীতির মূলে রয়েছে। আর এই পথে বিনিময় বা মুদ্রাগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসারের সাথে সাথে অধিকতর মূলধন গড়ে উঠেছে এবং সেই মূলধনকে যথাযোগ্য পথে নিয়োগ করার সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে।

এবং আরও একটি জানা বিষয় পরিষ্কার হল, 'ভোগ এবং বিনিয়োগ' এই অবস্থাতে পরিপূরক। উন্নততর ভোগমান অধিকতর উৎপাদন প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করবে—যার ফলে আয় বাড়বে এবং তাতে ভোগ এবং মূলধন সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক ভোগমানের প্রদর্শনীর খারাপ দিকটা দেখাতে গিয়ে অপর আরেকটা দিক দেখা হয় নি—তা হল নূতন ও বিচিত্র ধরনের ভোগপণ্য কিনতে হলে আমাদের আয় বাড়াতে হবে—আর এই বর্ধিত আয় সৃষ্টি করতে হলে আমাদের অবশ্যই মূলধনের যোগান বাড়াতেই হবে। এতে যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটবে তার ফলে মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ ঘটবে এবং সাথে সাথে সঞ্চয়ও বাড়তে থাকবে। একথা সত্য। কিন্তু যখন পরিকল্পনার মাধ্যমে বাঞ্ছিত পথে সর্বাঙ্গীন ও সর্বজনীন মঙ্গলের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাবার চেষ্টা চলে তখন ভোগ-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে বাঞ্ছিত পথে বিনিয়োগ করাই রীতি—সেখানে ভোগ বা বিনিয়োগের ব্যাপারে অবাধ ব্যবসায় ও লেসে ফেরার নীতি চলতে দিলে দ্রুত ও ব্যাপক ভাবে শিল্পায়ন সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

যদুভট্ট

যদুভট্ট ওস্তাদের এই সহসা রুদ্রভাবের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। মিয়াঁ সাহেবের চিৎকার শুনে তাঁর পিয়ারী বেরিয়ে এসে এত রোষের কি হেতু জিজ্ঞাসা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলেন যে তিনি ও তাঁর আদরের পালিত পুত্র ওস্তাদের প্রতিষ্ঠা ও ইজ্জতকে জাহান্নামে পাঠাবার বেশ উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। যদু যদি গোয়ালিয়রে আর কয়েকদিন অপেক্ষা করে তা হলে জনমুখে তার সঙ্গীত দক্ষতার স্তুতিবাদ চারিদিকে প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা এবং তারপর ওস্তাদের মান ও নাম বাঁচান শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। অতএব যদুকে এখুনি গোয়ালিয়র ছেড়ে চলে যেতে হবে দূরে—বহুদূরে। বহু অনুনয় বিনয়ে পিয়ারী ওস্তাদকে রাজী করালেন যে সে রাতটুকু থেকে যদুভট্ট পরদিন প্রত্যুষে গোয়ালিয়র পরিত্যাগ করবেন। এত কঠোর পরিশ্রমের পর কেবল একটি গীতকে পুঁজী করে চলে যেতে হবে এ চিন্তা যদুকে বিভ্রান্ত করে তুল্ল। তিনি ন্যায় অন্যায় বোধকে ঘুমপাড়িয়ে গৃহে ওস্তাদের সংগৃহীত সঙ্গীতের যা কিছু পুঁথি পাঠা ছিল সেগুলি ঝুলিতে ভরে নিয়ে তানপুরাটি কাঁধে ফেলে গভীর রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে গোয়ালিয়র পরিত্যাগ করলেন। এখন তাঁর গন্তব্যস্থান হল বিষ্ণুপুর এবং সেই পথ চলতে তিনি অতিক্রম করে চলেছেন বহু বন, প্রান্তর, নদী, গ্রাম ও শহর। এমনি ভাবে যেতে যেতে একদিন সন্ধ্যায় তিনি পৌঁছালেন বনানীর অঞ্চলগত সবুজের আড়ালে ঢাকা এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে। সেখানে রাতটুকু কাটাবার প্রার্থনা করায় সাধুজী তাঁকে স্বাগত জানিয়ে কুটিরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। ভট্ট মহাশয়ের নজরে পড়ল দেওয়ালে টাঙ্গানো একটি তানপুরার প্রতি। ভাবলেন একাকী বনবাসী সন্ন্যাসী তানপুরার সহযোগে কি ধরনের গান গাইতে সক্ষম। আহারান্তে তাঁকে যদুভট্ট বল্লেন দেওয়ালে তানপুরা সযত্নে টাঙ্গানো দেখে মনে হচ্ছে সাধুজীর গান টানের চর্চা আছে এখন একটু কৃপা হতে পারে কি? তিনি হেসে বল্লেন "ভেইয়া গান তো গাইনা একটু ভজন করে থাকি। আর যাঁর নাম ভজন করি তাঁর কানে আমার কন্ঠস্বরকে একটু রঙদার করে তুলবার জন্যে তানপুরার তারগুলিতে একটু টুং টাং লাগাই। কিন্তু আপনি যখন তানপুরাকে বহন করে এত দেশ ঘুরে এসেছেন এবং যাবেন বহুদূর তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে এক বিখ্যাত গায়কের পদধূলি এ দীনের আশ্রমে পড়েছে। আমার মত উদাসীন সন্ন্যাসীর এমন সৌভাগ্য তো সহজে হয়না তাই অনুরোধ করছি আপনার একটু সঙ্গীত সেবা হোক। যদুভট্ট ভাবলেন এই সাধুর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে হয়ত কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই তবুও আতিথেয়তার প্রতিদানে অন্তত সুকণ্ঠ ধ্বনি দিয়ে একে একটু তাক লাগিয়ে দেওয়া যাক্। তিনি শুরু করে দিলেন ওস্তাদজী-দত্ত দরবারী তোড়ী।

সঙ্গীত শেষ হলে সাধুজি খুব তারিফ করে বল্লেন "সাবাস আপনার সমকক্ষ গায়ক যে ভারতের কোথাও নেই একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। প্রশংসায় প্রীত যদুভট্ট বল্লেন "সাধুজি আপনার এইবার একটু ভজন হোক"। তিনি জানালেন যে তাঁর গানের সময় নিয়মে বাঁধা। অষ্টপ্রহরে একবার মাত্র সূর্য্যোদয়ের পূর্বে শুরু হয় তাঁর ভজন। প্রত্যুষে ঘুম ভাঙলেই তিনি শুনতে পাবেন তাঁর গীত।

তখন রাত্রির চতুর্থ প্রহর শেষ প্রায়। কোন এক অপূর্ব অমৃতময় সুর ধারা যদুভট্টের ঘুম ভাঙিয়ে সুপ্ত কানকে জাগ্রত করে দিল। কৃচ্ছ্র সাধনায় অর্জিত আপন কণ্ঠস্বরকে যদুভট্ট ভেবেছিলেন সুরপ্রকাশে অদ্বিতীয়, এখন সন্ন্যাসীর বিশুদ্ধ উদাত্ত স্বর শুনে তাঁর মনে হল যে তাঁর গলায় জমে আছে বহু খাদ ও আবর্জনা। বাইরে বেরিয়ে দেখলেন যে সাধুজি বীরাসনে বসে তানপুরা ধরে গাইছেন রাগ ভৈরব। ভোরের আলোয় কালো বনের উপরে ফিকে বেগুণী রঙএর আকাশের এক প্রান্তে রক্তিম আভা সূর্য্য উঠবার আগমনী জানাচ্ছিল। তন্ত্রীর ঝংকারে সম্মিলিত কণ্ঠের কল্লোলিত সুর আশে পাশের ঘুমিয়ে থাকা গাছপালাদের যেন স্নেহময় হাতের স্পর্শে জাগিয়ে দিচ্ছিল। শিশিরে ভেজা পাতাগুলি নড়ে যেন উন্মিলিত হচ্ছিল প্রকৃতিদেবীর শতচক্ষু। বনানীর ফাঁকে দিগন্তের সীমাশেষে দেখা গেল জলন্ত ধাতবচক্রের মত রাঙা উদিত সূর্য্যের অগ্নিময় একফালি। সেটি ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল চারিদিক লাল ফাগুয়ার রশ্মিতে রাঙিয়ে। পূর্ণোদিত সূর্য্যের রক্তিম পিণ্ড যেন সাধুজির সুরে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল কুটিরের দিকে এবং তার পরিধি ক্রমে হতে লাগল বৃহৎ থেকে বৃহত্তর। শেষে যদুভট্টের সামনে থেকে আর সব রঙ ও রেখা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং এল সর্বব্যাপী আগুন রাঙা রক্তিমার একাকার। তিনি যেন দেখতে পেলেন সেই জ্যোতির্ময় উদিত সূর্য্যের চক্র থেকে বেরিয়ে এলেন নন্দীর বাহনে প্রসন্ন বদন শিব ও পার্বতী। তাঁদের দুজনের হাত থেকে স্বর্গীয় আশীর্বাদ যেন ঝর্ণা হয়ে সাধুজির সর্বাঙ্গকে সিঞ্চিত করতে লাগল।

হঠাৎ বিরাট এক নাড়া পাওয়ায় যদুভট্টের সামনে থেকে স্বপ্নের মত সব উবে গিয়ে এল আর এক বাস্তব দৃশ্য। তিনি দেখলেন অস্তগামী সবিতার লাল আভা কিছুটা তাম্রভ হয়ে দিগন্তে আঁধারের শত বাহু বিস্তারে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সাধুজি বল্লেন "ভেইয়া সকাল থেকে বেহুস বসে আছো ডাকলে সাড়া দাও না, ব্যাপার কি? ভাবলাম বুঝি ধ্যানে বসেছ। কিন্তু সন্ধ্যে হচ্ছে দেখে তোমার সমাধি ভেঙ্গে দিলাম। যদুভট্ট তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বল্লেন "আমার সঙ্গীত পারদর্শীতার যে অহঙ্কার ছিল তাকে ভেঙে সাধুজি আপনি উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন। এখন ক্ষমা করে আমায় আপনার শিষ্যত্বের অধিকার দিন। জীবনের বাকিটা আপনার কাছে আপনার শিক্ষায় ও সেবায় কাটিয়ে দেব।" সাধুজি তাঁকে থামিয়ে বল্লেন "আমার ভজন আর তোমার গান গাওয়ার উদ্দেশ্যটা ভুলে যাচ্ছো ভেইয়া। আমি গাই উমাশঙ্করকে খুসী করতে আর তুমি গাইবে সমাজের সঙ্গীতামোদীদের আনন্দ দিতে। এই হচ্ছে তোমার জীবনাদর্শ ও ব্রত তাকে সার্থক করতে তুমি দেশান্তরে গিয়ে কত সাধনা করেছো। তোমার জীবনের আদর্শ ও সংস্কার আমার থেকে ভিন্নতর। একমুহূর্তের সাময়িক ভাবপ্রবণতায় তাকে তো বরাবরের মত বদলিয়ে ফেলান যায় না। তাই তোমাকে তোমার যোগ্য পথ ছাড়িয়ে আমার রাস্তায় চলার অনুমতি আমি দিতে পারি না। সমাজে থেকেও তুমি আমার মতই শঙ্করের সেবা করতে পারবে বহুজনকে তোমার সঙ্গীতে তৃপ্ত করে, কারণ সর্বজীবের অন্তরে তিনি সর্বদা বিরাজমান। লোক সমাজের মধ্যে তুমি যে সঙ্গীত পারদর্শীতা অর্জন করেছো তা অতুলনীয়। ফিরে যাও বন্ধু সমাজে, সঙ্গীতের অমৃতধারা বিতরণ কর জনে জনে। শম্ভু তোমার কল্যাণ করুন। মনক্ষুণ্ণ হলেও যদুভট্ট মেনে নিলেন সাধুজির আদেশ। আবার তাঁর যাত্রা শুরু হল বিষ্ণুপুর অভিমুখে।

বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে দোলপূর্ণিমায় প্রতি বৎসর আয়োজন হোত এক বিরাট সঙ্গীত সম্মেলনের এবং এই সভায় আহূত হতেন দেশ দেশান্তর থেকে সঙ্গীতের পুরোধারগণ। এই

আসরে যিনি সেরা গায়ক প্রতিপন্ন হতেন তাঁকে রাজা দিতেন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। যদুভট্টের পিতার মৃত্যুর পর প্রতিবৎসর সেরা গায়কের সম্মান পেতেন তাঁর পিতৃব্য।

যদুভট্ট হিসাব করে বিষ্ণুপুরে হাজির হলেন দোল পূর্ণিমার দিন। আগের মত আবার আয়োজন হয়েছে সঙ্গীতের এক বিরাট আসরের। প্রচুর লোকসমাগমের মধ্যে উদাসীন সাধুর বেশধারী তাঁকে কেউ চিনল না। নানান স্থান থেকে রাজার দেওয়া সেরা গায়কের সম্মান ও পুরস্কার প্রয়াসী গায়করা উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে আপন আপন ঘরোয়ানা ওস্তাদীর ভাণ্ডার উজাড় করে এনে ফেলেছেন বাছাই সঙ্গীতের এক হাট। সকলের মনে এক চিন্তা যে এ গানের হাটে কোন জহুরী সঙ্গীতের সবচেয়ে মনোহর জহরৎ দেখিয়ে পেয়ে যাবে সেরা ইনাম। প্রতিযোগি সকল গায়কদের কসরৎ দেখান হয়ে গেলে সর্বশেষ অনুষ্ঠানের আসন নিলেন যদুভট্টের পিতৃব্য। সকলেই জানে যে আগের বৎসরগুলির মত এবারেও সেরা গায়কের সম্মান ও পুরস্কার তিনিই পেয়ে যাবেন। নিজের কৃতিত্ব ও সাফল্যের নিশ্চিত বিশ্বাসে গর্বিত বিষ্ণুপুরের রাজার সভাগায়ক ধরলেন সুর। আলাপের পর গীতের বিলম্বিত বিস্তারে, স্বরগ্রামের ছন্দে, তানের বৈচিত্র্যে সুরকে রকমারি দৌড় ঝাঁপ খাইয়ে যখন তিনি তাঁর কসরৎ শেষ করলেন, সভায় সমস্বরে ধন্য ধন্য রব উঠল। যাঁরা তাঁর প্রতিস্পর্দ্ধিতার চেষ্টা করেছিলেন পরাজিত হয়ে অধোবদনে নিজেদের যেন ধিক্কার দিচ্ছিলেন। এমন সময়ে কার বজ্রনাদ সকলকে স্তম্ভিত করল। কে বল্ল "কুছ নেহি হুয়া, এ কেবল সুরের মিথ্যে মেহনৎ, একে সঙ্গীত বলা চলে না।" সবাই চেষ্টা করছিল আবিষ্কার করতে কার এতবড় ধৃষ্টতার সাহস হয়েছে। যদুভট্ট আবার বল্লেন মার্গ সঙ্গীতের নামে এসভায় হয়েছে কেবল বুজরুকি। উত্তেজিত শ্রোতার দল তাঁর রূঢ়োক্তির জন্য মারমুখি হয়ে পাগল ভেবে তাঁকে বল প্রয়োগে সভা থেকে বের করে দিতে উদ্যত হোল। রাজা তাঁর অনুচরদের আজ্ঞা দিলেন যে এই অর্বাচীনকে তাঁর সামনে ধরে নিয়ে আসা হোক। যদুভট্টকে উদ্দেশ করে তিনি বল্লেন "সন্ন্যাসী তোমাকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে এখানের সেরা সঙ্গীতে কেবল মিথ্যে সুরের মেহনৎ করা হয়েছে। আমার সভা গায়কের এতবড় অসম্মানকারিকে আমি বিনা বিচারে ও বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দিতে রাজি নই।" নীরবে যদুভট্ট বীরাসনে তানপুরা হাতে নিতে সভায় হট্টগোল থেমে গেল। একটা অতি নিকৃষ্ট, বেসুরো ও বেতালা গানের প্রহসন হবে তারই অপেক্ষামান শ্রোতাকুল হঠাৎ চমকে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরের প্রথম অবদানে। এতক্ষণ সুর যেন একটা পোষা পাখীর মত গায়কের খেয়াল অনুযায়ী দাঁড়ের উপরে ও নীচে নাচানাচি করছিল এখন যদুভট্ট তাকে বন্ধনমুক্ত করে উঠিয়ে নিয়ে চলেছেন ঊর্ধে বহু ঊর্ধে—সীমাহীন অনন্তে। তাঁর সঙ্গীতের সম্মোহনে শ্রোতাদের দেহ মলয়হিল্লোলে নৃত্যমান পল্লব ও লতার মত তালে ও ছন্দে দুলছিল। একটা তীব্র সুখময় উত্তেজনার অনুভূতি সঙ্গীত সমাপ্তির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে সকলের শরীরে আনল অবসাদ আর মনে জাগল তাকে পুনরায় ফিরে পাবার অধীর আকাঙ্খা। শ্রোতাদের মধুময় সঙ্গীত উপভোগে শ্লথ মন ও দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার আগেই অলক্ষ্যে যদুভট্ট আসর পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। রাজা তাঁকে শ্রেষ্ঠ গায়কের পুরস্কার দিতে গিয়ে দেখলেন গায়কের আসন শূন্য। একটা অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক এই ঘটনা শুধু গীতামোদি রাজাকে নয় বিষ্ণুপুরের সুরপাগল নাগরিকদেরও বিস্ময় ও জিজ্ঞাসায় অভিভূত করে তুল্ল।

যদুভট্ট শহরের বাইরে গ্রাম্যাঞ্চলে গিয়ে অনেক বছরের বর্দ্ধিত কেশ শশ্রু ও গুম্ফের জালকে কাটিয়ে ভব্য হয়ে সন্ন্যাসির বেশ পরিত্যাগ করে সন্ধ্যায় পৈত্রিক ভবনে উপস্থিত হলেন। আপন পরিচয় দিতে মাতা ও পত্নীর হারানো রত্ন ফিরে পাওয়ার আনন্দোচ্ছ্বাস নিঃশেষ হলে পরে শুরু হল তাঁর দায়িত্ব কর্তব্য ও হৃদয়হীনতার জন্য শত অনুযোগ অভিযোগ ও ভৎর্সনা।

তাঁদের কলরবে আকৃষ্ট পিতৃব্য ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের সন্তানগণ এসে যদুভট্টকে আরো তীব্র ভৎর্সনা ও ধিক্কারে অভ্যর্থনা করলেন। পূর্বকার অপরাধ ও জড়োকরা পাপস্খলনের জন্য যদুভট্টের এখনু কি করা উচিত তার বোঝা পড়া করে সকলে ক্লান্ত হওয়ায় সে রাতের মত তাঁকে রেহাই দেওয়া হল। পরের দিন সকালে তাঁর পিতৃব্য তাঁকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন যে সে সংসারে তাঁর শুধু বসে বসে অন্নধ্বংস করা চলবে না। যে কাজগুলি সাধারণত ভৃত্যের জন্য বরাদ্দ থাকে তাঁর উপর সেগুলি ন্যস্ত করা হোল এবং উপসংহারে পিতৃব্যদেব তাঁর হৃষ্টপুষ্ট শরীরের প্রতি নির্দেশ করে বল্লেন যে এমন স্বাস্থ্যবান বলদের পক্ষে এ কাজগুলি কোন মতেই শ্রমদায়ক হতে পারে না। যদুভট্ট তাঁকে বল্লেন, এসব কাজ করতে তাঁর কোন আপত্তি নেই যদি তাঁকে অবসরে সঙ্গীতাভ্যাসের সুযোগ দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে পিতৃব্য এক বিশেষ ভ্রূ ভঙ্গি করে বল্লেন যে এমন মূর্খকে গান শিখিয়ে গর্দভ রাগিনীর সৃষ্টি করবার তাঁর কোন স্পৃহা নেই। বড় হওয়ার সঙ্গে এই সত্যটি বুঝবার মত যদুভট্টের বুদ্ধি বাড়ে নি বলে তাঁর প্রচুর আফশোষ হল।

পিতৃব্য পুত্র গাইছিল গান। সকলের বিশ্বাস যে সঙ্গীতের পারদর্শীতায় সে শীঘ্রই পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী প্রতিপন্ন হবে। তার সান্নিধ্যে যদুভট্টকে দাঁড়িয়ে গান শুনতে দেখে পিতৃব্য অতি রূঢ়ভাবে সে স্থান ত্যাগ করে সংসারের অন্য কাজে রত হতে বল্লেন। যদুভট্ট বিচলিত না হয়ে বল্লেন "খুড়া মহাশয় পুত্রকে গীত দেবার আগে তার কণ্ঠস্বরকে একটু মেজেঘসে সুরস্থ করবার ব্যবস্থা করলে ভাল হতো না কি? তাঁর এই স্পর্দ্ধাজনক উক্তিতে ক্ষিপ্ত পিতৃব্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন সাহসে তিনি এমন মন্তব্য করছেন যখন সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁর লেশমাত্র অধিকার হয়নি। তিনি উত্তর দিলেন যে এত বৎসরের দেশপর্যটনে বহু বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত গায়কের সান্নিধ্য পেয়েছেন তো বটেই তাঁদের প্রসাদে অল্পবিস্তর সঙ্গীতচর্চা করবারও সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। ব্যঙ্গ করে খুড়া মহাশয় বল্লেন যে নিশ্চয় তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী তিনি কোকিল ভক্ষণ করায় এখন কুহুতান ধরে তানসেনকেও পরাস্ত করে দেবেন। তিনি তাঁকে তাঁর সঙ্গীত বিদ্যার নমুনা দেখাবার জন্য আদেশ দিলেন। যদুভট্ট তানপুরা নিতে পিতৃব্য অবজ্ঞার সঙ্গে বসলেন একটা অশ্রাব্য সুর শোনার পীড়নকে সহ্য করবার জন্যে। কিন্তু তানপুরার তন্ত্রীধ্বনিতে প্রথম স্বর সংযোগ তাঁকে যেন কষাঘাতে চমকিত করল। রাজসভায় যে সন্ন্যাসী তাঁকে সঙ্গীতের পারদর্শীতায় অপদস্থ করেছিল সে এবং যদুভট্ট যে অভিন্ন তাতে তাঁর আর কোন সন্দেহ ছিল না। মর্ম্মাহত ও আত্মগ্লানিতে পীড়িত খুড়ামহাশয় যদুভট্টের হাত ধরে বল্লেন, "আমার অগ্রজের পুত্রের উপযুক্ত অধিকার না দেওয়ায় তুমি আজ সঠিক সাজা দিয়েছ। যে অন্যায় করেছি তাকে তো আর মুছে ফেলা যাবে না। এখন আমার শাস্তির মাত্রাকে পরিপূর্ণ করতে যেটুকু করা উচিত তা সম্পন্ন করে ফেলা যাক্। চল আমার সঙ্গে রাজ দরবারে। যদুভট্ট পিতৃব্যের মান এমনভাবে খর্ব হওয়ায় লজ্জিত হয়ে বল্লেন তাঁর জীবনের একমাত্র আকাঙ্খা ছিল সঙ্গীতের আরাধনা করে পারদর্শীতা লাভ করা। সে অভিলাষ যখন পূর্ণ হয়েছে রাজদরবারের সমাদর তার কাছে মূল্যহীন। কিন্তু তাঁর পিতৃব্য জোর করে তাঁকে নিয়ে গেলেন রাজসমীপে এবং সেখানে সব ঘটনা বিবৃত করে বল্লেন "মহারাজ আমি আজ পরাজিত বলে একটুও ক্ষুন্ন নই কারণ রাজদরবারে সেরা গায়কের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা আগেরই মত বজায় রয়ে গেছে ভট্ট পরিবারে। গ্রহণ করুন আজ আপনার নতুন সভাগায়ককে—আমারই অগ্রজের পুত্র সে ভারতের অদ্বিতীয় সুরবিদ্ ও সুকণ্ঠ যদুভট্ট।"

সাহিত্যে আজগুবিয়ানা

অজিতকৃষ্ণ বসু

অঙ্কের মাস্টার বিরিঞ্চিবাবু ক্লাসে ইউক্লিডের জ্যামিতি পড়াচ্ছিলেন। কালো বোর্ডের বুকে সাদা খড়ি দিয়ে একটি ত্রিভুজ আঁকলেন তিনি। এটি কোনো 'বিশেষ' ত্রিভুজ নয়, 'যে-কোনো' ত্রিভুজ—কখগ। আজ তাঁর ছাত্রদের কাছে এইটে প্রমাণ করে বোঝাবার কথা যে এই ত্রিভুজের যে কোনো দুটি ভুজের যোগফল বাকি ভুজটির চাইতে বড়; অর্থাৎ কখ আর খগ পর পর জুড়লে লম্বায় কগ-র চাইতে বড় হবে।

এ তত্ত্বটি সর্বপ্রথম ইউক্লিড প্রমাণ করে গেছেন প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাঁরই প্রদর্শিত পদ্ধতিতে এই একই তত্ত্ব কত দেশে কত গ্রন্থে কত ক্লাসে কত পরীক্ষার খাতায় কতবার প্রমাণিত হয়েছে, চিত্রগুপ্ত বা মহাকাল ছাড়া আর কারও কাছে তার হিসেব পাওয়া যাবে না।

বিরিঞ্চি বাবু এ তত্ত্বটি প্রমাণ করে আসছেন গত চৌত্রিশ বছর ধরে, এই স্কুলেই। বছর বছর ছাত্র বদলেছে, এই দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরে কত ছাত্র এলো কত গেল, কিন্তু বিরিঞ্চি বাবু আছেন, ইউক্লিডের জ্যামিতিও আছে।

সমস্ত ক্লাস স্তব্ধ, তটস্থ, সন্ত্রস্ত। বিরিঞ্চি বাবু বরাবরই দেহের ওজনে হালকা হলেও মেজাজের ওজনে রাশ্‌ভারি, ছাত্ররা সবাই তাকে ভয় করে। তার ওপর আজ তিনি অসাধারণ গুরুগম্ভীর বিরাট ঝড়ের আগে প্রকৃতির থমথমে ভাব আঁকা তাঁর মুখে। কেউ টুঁ শব্দটি করতে ভরসা পাচ্ছে না। মেঝেতে একটি আলপিন পড়লেও তার আওয়াজ পরিষ্কার শোনা যাবে কিন্তু একটিও আলপিন পড়ছে না।

বোর্ডে জ্যামিতিক নক্সা এঁকে বিরিঞ্চি বাবু এর আগে কোনও ক্লাসে এমন করে থমকে দাঁড়িয়ে থাকেন নি। আজ তাঁর হয়েছে কি? দেখা যাক এইবার তিনি কি করেন।

এইবারে এক অদ্ভুত ব্যাপার করলেন তিনি। এতদিনের সম্মান পাওয়া প্রমাণকে এক নিশ্বাসে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন "কখ আর খগ-র যোগফলের চাইতে কগ বড়।" একি আজগুবি কথা আজ জ্যামিতির নামী শিক্ষক বিরিঞ্চিবাবুর মুখে? প্রত্যেক ছাত্রের সামনে জ্যামিতির বই খোলা, প্রত্যেক ছাত্র সভয়ে দেখছে যা প্রমাণ করতে হবে বিরিঞ্চিবাবু ঠিক তার উল্‌টো বলছেন। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল বিরিঞ্চিবাবুর দিকে কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে।

"কখ আর খগ-র যোগফল কগ-র চাইতে ছোট।" আগে বলা কথাটাই নতুন করে এভাবে ঘুরিয়ে বললেন বিরিঞ্চিবাবু। কণ্ঠে তেমনি সহজ দৃঢ়তা।

প্রতিবাদ করা দরকার। না করলে 'ইউক্লিডের মান থাকে না। কিন্তু কেউ সাহস পাচ্ছে না প্রতিবাদ করে 'ইউক্লিডের মান রাখতে; বিরিঞ্চিবাবু বাঘ না হলেও ছাত্ররা তাঁকে বাঘের মত ভয় করে।

ক্লাসের সেরা ছাত্র ত্রিশংকু হালদার। কোনো পরীক্ষায় সে দ্বিতীয় হয় না, বরাবর অদ্বিতীয়। এত বড় ভুলের প্রতিবাদ না করলে সারা ক্লাসের কাছে তার মাথা হেঁট হয়ে যাবে ভেবে সে শংকিত হয়ে উঠল।। তারপর বিনীত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠে নিঃসংকোচের ভান করে বললেঃ

"কিন্তু স্যার, ইউক্লিড যে বলছেন —"

বিরিঞ্চি বাবু বললেন "বলুক।"

মরিয়া হয়ে ত্রিশংকু বললে "কিন্তু স্যার, আপনি যা বলছেন তার প্রমাণ—?"

"দরকার নেই।" বললেন বিরিঞ্চিবাবু।

আরো মরিয়া হয়ে ত্রিশংকু বললে "কিন্তু স্যার, পরীক্ষার খাতা—?"

বিরিঞ্চি বাবু বললেন "চুলোয় যাক।"

ত্রিশংকুর মনে হল এর চাইতে বেশী মরিয়া হতে গেলে বিরিঞ্চি বাবুর হাতে মারা পড়বার ভয় আছে। তাই প্রাণের ভয়ে সে থেমে গেল। সারা ক্লাস জুড়ে থমথমে ভাব। "কি হয়েছে আজ বিরিঞ্চি বাবুর?" এই প্রশ্ন সবার মনে। তারা বুঝতে পারে নি চৌত্রিশ বছর একঘেয়েমির পর আজ হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে বিরিঞ্চি বাবুর খেয়ালী মন। তারা যে বুঝতে পারে নি, একথাটাও যেন হঠাৎ খেয়াল হলো তাঁর। বললেন "খেলার মাঠে চলে যা তোরা।"

নিজে ক্লাস থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন নদীর ধারে বটগাছের তলায়, যেখানে এক ফুলুরি-ওয়ালা বসে বিশ্রাম করছিল। তার ঝুড়িতে বিশ্রামরত কিছু অবিক্রীত ফুলুরি; তাদের মেজাজ অনেকক্ষণ ধরে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। ফুলুরিওয়ালার পাশে বসে পড়লেন বিরিঞ্চি বাবু। এক গণ্ডা ফুলুরি কিনে খেতে লাগলেন। গত চৌত্রিশ বছরের ভেতর এই তাঁর প্রথম ফুলুরি খাওয়া। একটি আস্ত সিকি দিয়েছিলেন ফুলুরিওয়ালাকে। ফুলুরিওয়ালা হিসেব করে দাম রেখে বাকি পয়সা ফেরৎ দিতে যাচ্ছিল, ধমক দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন বিরিঞ্চিবাবু। পুরোনো হিসেব, পুরোনো মানদণ্ড, পুরোনো মাপকাঠি। পুরোনো মূল্যবোধ —সব কিছুই আজ বাতিল হয়ে গেছে তাঁর কাছে। অনেকদিন নিয়মের খাপে আট্‌কে থেকে থেকে হয়রান হয়ে আজ তিনি মেতেছেন মহা খাপছাড়ামির নেশায়।

"দুই দুগুণে কত হয়, ফুলুরিওয়ালা?" শুধালেন অংকের মাস্টার বিরিঞ্চিবাবু।

ফুলুরিওয়ালা ভয়ে ভয়ে বললে "আজ্ঞে চার।"

"পাঁচ।" বললেন বিরিঞ্চি বাবু।

ফুলুরিওয়ালা আম্‌তা আম্‌তা করে বললে "কিন্তু হুজুর ধারাপাতের নামতা—"

বিরিঞ্চি বাবু বললেন "চুলোয় যাক।"

তাঁর মন্তব্যে কিঞ্চিৎ উষ্ণতা অনুভব করে নীরব রইল ঠাণ্ডা ফুলুরিওয়ালা।

এরপর বিরিঞ্চি বাবু আরো যা যা বলেছিলেন এবং করেছিলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এইটে শুধু বোঝা দরকার যে বিরিঞ্চি বাবুর এই কাহিনী বাহ্যত স্থূল হলেও এর ভেতরে একটি সূক্ষ্ম রূপকের আবেদন রয়েছে। বিরিঞ্চি বাবু কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তি নন, তিনি যে কোনো মানুষের প্রতিনিধি। প্রত্যেক মানুষ নানা রকম সীমার বাঁধনে বন্দী, আর তার অন্তরাত্মা অবচেতনভাবে প্রতি মুহূর্তে সেই সীমা বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অনুভব করছে। অধিকাংশ সময় সেই বিদ্রোহানুভূতি অবচেতনার স্তরেই গোপন থেকে যায়, চেতনার স্তরে ভেসে উঠতে পারে না বলেই ওঠে না। কিন্তু কোনো কোনো মুহূর্তে এই অবচেতন বিদ্রোহ সচেতন হয়ে ওঠে। বিরিঞ্চিবাবুর হঠাৎ খামখেয়ালীর খাপছাড়া কাহিনীটি তারই রূপক।

সেই সব বিশেষ "কোনো কোনো" মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা সরে যায়। নতুন দৃষ্টির আলো ফুটে ওঠে চোখের তারায়। তখন সত্যি সত্যি উপলব্ধি করা যায় আমাদের রোজকার অভ্যস্ত হিসেবটাই চরম হিসেব নয়, যে জগতে দুয়ে দুয়ে চার হয় তার চাইতে কম সত্য নয় দুয়ে দুয়ে পাঁচের জগৎ। শুধু দুজগতের মাপকাঠি আলাদা। যাকে চলতি আর্ট-পোরে ভাষায় বলি বাস্তব জগৎ, সেটাই একমাত্র জগৎ নয়, যাকে 'অবাস্তব' জগৎ বলে' কেউ কেউ

—অথবা অনেকে—উড়িয়ে দিতে চান, সে উড়ে যায় না।

একটি মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক বোধে উদ্ধৃত করছি :

"যুক্তি ও নিয়মের ফাঁদে পড়িয়া আমাদের অন্তরাত্মা অহরহ অবচেতনার স্তরে হাঁফাইয়া মরিতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক মহা নিয়মের শৃঙ্খলায় পরিচালিত হইতেছে বলিয়াই সুসমঞ্জস অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, লণ্ড ভণ্ড, খণ্ড বিখণ্ড, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় নাই ইহা সত্য বটে। কিন্তু মানবাত্মার গভীরে আছে উন্মাদ ছন্নছাড়ামির ছোঁয়াচ, শৃঙ্খলাকে মাঝে মাঝে তাহার শৃঙ্খল বলিয়াই মনে হয়। অহরহ চারিদিকে নিয়মের খেলা দেখিয়াই সে কখনো কখনো খেলা ভাঙ্গার খেলায় মাতিয়া উঠে, শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার উন্মাদনায় শৃঙ্খলা ভাঙ্গে।"

এই ভাঙ্গার উন্মাদনা থেকেই হয় সাহিত্যে আজগুবি কল্পনার উদ্ভব। আমার প্রিয় খেয়ালী কবি একটি কবিতায় বলছেন :

"Sanity ! Sanity ! Sanity gets on my nerves.
O let me have lucid intervals of insanity,
Moments of sublime illogic, making logic ridiculous,
Lest all logic and no illogic should deaden my soul.
Then let my two plus two defy mathematics
and refuse to be four,
My rhino-ceros and my hippopotamus coalesce
Into the rhinopotamus or the hippoceros,
My Mark Antony defy history to elope with
Helen of Troy.
O let some fine folly save me from
wooden wisdom,
Some oases of nonsense smile on my
Sahara of sense.

কবিতাটির শেষ পংক্তিটিতে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সাহিত্যে আজগুবি কল্পনার মূল তত্ত্ব : "Some oases of nonsense smile on my Sahara of sense". উক্ত কবিতায় কবি যে মানসিক পরিস্থিতির আভাস দিয়েছেন, সে পরিস্থিতিতে 'বাস্তব' রাজার চাইতে বেশী আপন মনে হয় বোম্বাগড়ের রাজাকে, যিনি সর্বদাই ছবির ফ্রেমে আমসত্ত্ব ভাজা ঝুলিয়ে রাখেন; এবং রাজার পিসীকে কুমড়ো দিয়ে ক্রিকেট খেলতে দেখে মনে হয় ক্রিকেট খেলবার সেইটেই সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি।

জীবনে খাপের প্রয়োজন এবং গৌরব আছে বটে, কিন্তু খাপ ছাড়বার ও যে ঐ দুটোই আছে, তার অন্যতম প্রমাণ : স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও খাপছাড়া সাহিত্য রচনা করে' তার ওপর যথেষ্ট গুরুত্বের ছাপ মেরে রেখে গেছেন। অংকবিদ চার্লস্ ডজ্‌সনের অংক পাণ্ডিত্যের কথা আমরা ভুলে গেছি বললেই চলে, তিনি ছদ্মনামে বেঁচে আছেন তাঁর "অ্যালিস ইন ওআণ্ডারল্যাণ্ড" প্রভৃতি আজগুবি খাপছাড়া রচনায়। ডজ্‌সনী অংক-জগতের কঠোর যুক্তিতত্ত্বকে তিনি লুই ক্যারোলী আজগুবি সাহিত্যে খাপছাড়ামির হামানদিস্তায় গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়েছেন। আজগুবিয়ানার সে জগৎ আলাদা জগৎ, সেখানে দুয়ে দুয়ে চারের মত খাপছাড়া আর কিছু নেই।

কোনো একটি আসরে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছিলাম আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল

জটিল এবং গুরুগম্ভীর বিষয়ে একটানা বহুক্ষণ মাথা খাটিয়ে পরিশ্রান্ত হলে শ্রান্তি দূর করবার অর্থাৎ 'রিক্রিয়েশন'-এর জন্য উচ্চ গণিতের অংক কষতেন; সেইটেই ছিল তাঁর অবসর বিনোদন-মূলক ছেলেখেলা। এও হয় তো এক ধরণের খাপছাড়ামি। কিন্তু এই সব নয়। আচার্য শীল সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? রামানন্দ বাবুই বা কতটুকু জানতেন? আমার বিশ্বাস আচার্যত্বের খাপে বন্দী আচার্য শীল নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে খাপ ছেড়ে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাইতেন, এবং উচ্চ গণিতই তাঁর হাঁফ ছাড়বার একমাত্র ক্ষেত্র ছিল না। যদি কেউ বলত :

"শোনো তবে বলি। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। আচার্য শীল তখন তাঁর ঘরে একা একটি গম্ভীর গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত। আমি বসে আছি পাশের ঘরে। আচার্যের সাদা চুল, সাদা দাড়ি; দেখে মনে হলো যেন কোনো প্রাচীন ঋষি, গভীর সাধনায় মগ্ন। মুগ্ধ চোখে দেখছি মুক্ত বাতায়নের ফাঁক দিয়ে। সহসা ও কি? আচার্য হাঁই তুলে দাঁড়ালেন। ভেবে ভেবে মাথা আর লিখে লিখে হাত শ্রান্ত হয়েছে বোধ হয়। তারপর—কি আশ্চর্য! —আচার্য আপন মনে নৃত্য-ভঙ্গীতে একা ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন, আর হাত তালি দিতে দিতে গাইতে লাগলেন : ছি ছি এত্তা জঞ্জাল....."

কাহিনীটি খাপছাড়া বলেই অসম্ভব অবিশ্বাস্য বলে বাতিল করে দিতাম না। এবং মুহূর্তের জন্যেও ভাবতাম না এ কাহিনী সত্য হলে আচার্য শীলের আচার্যত্বের ওজন কিছুমাত্র কমবে। বরং ভাবতাম এতে এইটেই প্রমাণিত হলো যে তিনি মানুষ, 'রবট্' নন।

তেমনি বিশ্বকবিত্বের সঙ্গে তেলেভাজা (বেগুণী বা আলুর চপ) ভক্ষণের যোগাযোগটা যার কাছে যতই খাপছাড়া মনে হোক, বিশ্বকবি কোনো ফাগুন প্রাতে তেলেভাজার ফরমায়েস করছেন এ চিত্র আমি অনায়াসে কল্পনা করে নিতে পারি। অতি-সাধারণ মানুষের মত তেলে-ভাজা-প্রীতি তাঁর অতি অসাধারত্বের অমর্যাদা ঘটাবে, এ বিশ্বাস আমার নেই, তাঁর এ প্রীতিকে কারও কারও যতই খাপছাড়া, আজগুবি মনে হোক না কেন। দামী সত্য শুধু খাপের ভেতরই থাকে না, খাপের বাইরেও থাকে।

কেউ কেউ বলেন, যেধরণের সাহিত্য-প্রতিভা থেকে সাহিত্যে আজগুবিয়ানার সৃষ্টি, সে ধরণের প্রতিভা হচ্ছে 'এস্‌কেপিস্ট' বা পলায়নমুখী; সে প্রতিভা ভীরু, বাস্তববিমুখ, কল্পনা-বিলাসী। এর জবাবে বলা যায় প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যমাত্রেই 'এস্‌কেপিস্ট'। কারণ সাহিত্য ঠিক বাস্তবের প্রতিরূপায়ন নয়, হতে পারেও না। এমন কি যাকে বলি রিয়ালিস্টিক বা ফোটোগ্রাফিক সাহিত্য, তাও ঠিক বাস্তবের প্রতিরূপায়ন নয়, হওয়া অসম্ভব। বাস্তব রূপ আর সাহিত্য-রূপের মধ্যে একটা দূরত্ব থেকে যেতে বাধ্য, ঐ দূরত্বটুকুই হচ্ছে বাধ্যতামূলক পলায়নের মাপ। সাহিত্যে আমরা বাস্তবকে নতুন করে 'সৃষ্টি' করি; যতই রিয়ালিস্টিক অর্থাৎ বাস্তবধর্মী হই না কেন, এই সৃষ্টির কাজে কিছুটা দূরত্ব অপরিহার্য। যে নির্মম সত্য 'বাস্তব' জীবনে শুধু দুঃখই দেয়, সাহিত্য রূপে তার অন্তরের রূপ যায় বদলে। কবি বলেছেন :

"বিষের অন্তরে বসে অমৃত করিছে হাহাকার।"

বাস্তব দুঃখের (অথবা দুঃখময় বাস্তবের) সাহিত্য-রূপে আমরা পাই সেই বিষের অন্তরে লুকানো অমৃতের স্বাদ। ট্র্যাজেডি সাহিত্য তাই দুঃখের সাহিত্য হলেও দুঃখের সিঁড়ি বেয়ে দুঃখাতীতে পৌঁছবার রাস্তা।

বাস্তবে যার অভাব অনুভব করি তাকেই পাবার জন্যে সাহিত্যের দুয়ারে এসে দাঁড়াই। স্থূল বাস্তবের সূক্ষ্ম রসমধুর রূপ খুঁজি সাহিত্যে; এই রূপ-পিপাসা মেটায় যে সাহিত্য, তাকেই মানি সার্থক সাহিত্য বলে'। তাই বলি, তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে সাহিত্যমাত্রই কমবেশী

পলায়নমুখী। সুতরাং বেছে বেছে শুধু আজগুবি-সাহিত্যের কপালে পলায়নমুখিতার লেবেল এঁটে দেওয়া আর যাই হোক, শোভন নয়।

অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যে আজগুবি কল্পনা নিজেই নিজের লক্ষ্য, আপনাতেই পরিতৃপ্ত, অন্য কোনো লক্ষ্যে পৌঁছবার রাস্তা বা উপায় মাত্র নয়। ইংরাজিভাষায় যাকে বলে 'এণ্ড্ ইন ইট্‌সেল্‌ফ্'। অর্থাৎ কল্পনাটি অভিনবত্বে, বৈচিত্রে, বিস্ময়করত্বে বা মাধুর্যে মনোহারী, এই তার যথেষ্ট সার্থকতা, এর বেশীতে তার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সাহিত্যে আরেক রকমের আজগুবিয়ানাও আছে, আজগুবি কল্পনা যেখানে উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র, অর্থাৎ ইংরাজিতে 'এণ্ড্ ইন ইট্‌সেল্‌ফ্' নয়, 'মীনস টু অ্যান এণ্ড' মাত্র। যেমন ধরা যাক রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের বিখ্যাত উপন্যাস "ডক্‌টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড।" উপন্যাসটির প্লটে রয়েছে আজগুবিয়ানার চূড়ান্ত। ডাক্তার জেকিল ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক, আদর্শ-চরিত্র নাগরিক। তিনি অনুভব করতেন তাঁর ভেতরে একই সঙ্গে রয়েছে সুপ্রবৃত্তি এবং কুপ্রবৃত্তির দল। সুপ্রবৃত্তিগুলো বেশী জোরালো বলেই কুপ্রবৃত্তিগুলো দমিত হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ তিনি একটি ব্যক্তি হলেও তাঁর ভেতরে পাশাপাশি রয়েছে দুটি মানুষ—একটি ভালো, আরেকটি খারাপ। তিনি ভাবলেন : আচ্ছা, কোনো উপায়ে কি আমার ভেতরকার এই দুটি মানুষকে আলাদা করে ফেলা যায় না? ফেলা গেলে কেমন হয়? অনেকদিনের গোপন গবেষণার ফলে দুটি আরক আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন ডাক্তার জেকিল। একটি আরক খেলে কয়েক মুহূর্তের ভেতর সুপুরুষ দীর্ঘকায় আদর্শচরিত্র ডাক্তার জেকিল পরিণত হতেন কুদর্শন খর্বকায় বীভৎস চরিত্র মিস্টার হাইডে। এই মিস্টার হাইডই ডাক্তার জেকিলের সুপ্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন কুপ্রবৃত্তিগুলোর অবিমিশ্র সমষ্টিগত রূপ। অর্থাৎ জেকিলের ভেতরকার সব কিছু খারাপ নিয়েই হাইডের সৃষ্টি। অন্য আরকটি ছিল প্রতিষেধক, যা খেলে মিস্টার হাইড আবার ডাক্তার জেকিলে পরিণত হতেন। মিস্টার হাইডরূপী ডাক্তার জেকিল পর পর বীভৎস অপরাধ করে করে বেড়াতেন, মিস্টার হাইডের ভেতর কুপ্রবৃত্তিতে বাধা দেবার জন্যে সুপ্রবৃত্তি না থাকার দরুন কুপ্রবৃত্তিরা ফাঁকামাঠে গোলের পর গোল করত। মিস্টার হাইডের লাগামছাড়া অপরাধ-অভিযান দেখে ডাক্তার জেকিল ভীত হয়ে উঠলেন। শপথ করলেন আর কখনো হাইড হবেন না; এতদিন যা করে ফেলেছেন তা করে ফেলেছেন, অনুষ্ঠিত অপরাধের সংখ্যা আর বাড়াবেন না। এবারে ব্রেক কষতেই হবে।

কিন্তু পারলেন না। বড় বেশীদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। মিস্টার হাইড হবার জন্য আরক খাওয়া আর দরকার হত না; আভাসে ইঙ্গিতে পাপ বা অকল্যাণের কোনো কল্পনা মনে এলেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি মিস্টার হাইডে পরিণত হয়ে যেতেন। প্রাণপণ চেষ্টাতেও এ পরিণতি রোধ করতে পারতেন না অসহায় ডাক্তার জেকিল।

এরপর নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে অবশেষে শোচনীয়ভাবে ডাক্তার জেকিলের জীবনাবসান হল।

অদ্ভুত আজগুবি কাহিনী, কিন্তু আজগুবিয়ানার আমদানী এখানে শুধু রোমাঞ্চ সৃষ্টির জন্যে করা হয় নি। জীবন সম্পর্কে একটি গভীর সত্য রূপকের মাধ্যমে জোরালোভাবে ফুটিয়ে তোলাই এই আজগুবিয়ানার উদ্দেশ্য।

জোনাথান সুইফ্‌ট্-এর বিখ্যাত গ্রন্থ "গালিভারের ভ্রমণকাহিনী" সম্পর্কেও ঐ একই কথা। মানব-চরিত্রের বিভিন্ন প্রকার হীনতার ব্যঙ্গ-সমালোচনার উদ্দেশ্যেই সুইফ্‌ট্ তাঁর অসামান্য আজগুবি কল্পনা প্রতিভার প্রয়োগ করেছেন।

একটি চিন্তাশীল মনের চিন্তাধারা থেকে উদ্ধৃত করছি :

"There is an element of fantasy in every literary creation. No piece of literature can be a pure transcript of external reality, for all fact passing through a creative mind invariably becomes more or less fictionised. The difference between *fantastic* and non-fantastic literature is therefore fundamentally more a difference of degree than a difference of kind."

এ মন্তব্যে খানিকটা অতিভাষণ হয় তো আছে, কিন্তু এর মূলে রয়েছে সত্যের আভাস। উক্ত মন্তব্যের প্রায় অনুরূপ আরেকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করলে বিষয়টা হয় তো আরো পরিষ্কার হবে : "কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে সফল সাহিত্য বাস্তবের আরসিস্বরূপ। এই মতটি অনুসরণ কালে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আরসি-বক্ষে প্রতিবিম্বিত বস্তু বা ব্যক্তির বামে দক্ষিণে বিনিময় ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ বাম দক্ষিণ হয় এবং দক্ষিণ বাম হয়। সুতরাং আরসি-বক্ষস্থ প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বিতের স্বরূপ মিলিতে পারে না। উক্ত দিক-বিনিময় ব্যতীত আরও একটি কারণ বিদ্যমান, যাহার দরুন আরসিতে বাস্তবের রূপায়ন-প্রয়াস নবরূপায়নে, অপরূপায়নে, অথবা রূপান্তরে পরিণত হয়। সে কারণটি আরসির কাচের ঘনত্ব এবং কাচের পশ্চাৎ-দিকে পারদ-প্রলেপের ঘনত্বের ন্যূনাধিক্য, যাহার উপর প্রতিবিম্বের আপেক্ষিক স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা নির্ভরশীল। শুধু তাহাই নহে, যে আলোকে আরসি-বক্ষে প্রতিবিম্বায়ন ঘটে, সেই আলোকের বর্ণ এবং ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা ও প্রতিবিম্বের প্রকারগুণ নির্দ্ধারিত হইতে বাধ্য।"

এ মন্তব্যের ব্যাখ্যা এ মন্তব্যের মধ্যেই রয়েছে, সুতরাং টীকা অনাবশ্যক। মন্তব্যকারী সেই আলোর কথাই সম্ভবত বলতে চেয়েছেন যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আপন মনের মাধুরী" এবং ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থ বলেছেন : "The light that never was on sea or land."

খাপছাড়া, আজগুবি, উদ্ভট, অ-সাধারণ ভাবধারা বা কল্পনা ভিত্তি করে রচিত যে সাহিত্য, যাকে গোঁড়া অথবা গুরু-গম্ভীর পাঠক এবং সমালোচক মহল সাধারণত 'অ্যাব-নর্ম্যাল' বিশেষণে বিশেষিত করে খুশি হন, তাকে যদি সাধারণ, খাপ-না-ছাড়া, অনাজগুবি, অনুদ্ভট ভাবধারা বা শৈলী ভিত্তি করে রচিত 'নর্ম্যাল' বা 'কনভেন্‌শনাল' সাহিত্য থেকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য আজগুবি সাহিত্য নাম দেওয়া যায় তাহলে স্বীকার করতেই হয় এ সাহিত্য এখনো যথেষ্ট বা যথোচিত স্বীকৃতি লাভ করে নি, খুব বেশী দূর যে এগোতে পেরেছে তাও নয়। শেষোক্ত ব্যাপারটির একটি কারণ সম্ভবত পাঠক-পাঠিকা মহলে স্বীকৃতি বা সমাদরের অত্যল্পতা। এর মূল কারণ আবার হয় তো এই যে আজগুবি সাহিত্যের মূল্য; রস ও সার্থকতা সম্পর্কে সাধারণ পাঠককে সচকিত, শিহ্নিত, উৎসাহিত, আগ্রহী করে তুলবার মত সমবদার সমালোচনা-সাহিত্যও তেমন করে গড়ে ওঠে নি।

কিন্তু উঠছে। অস্বীকৃতির কুয়াসা ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে যাচ্ছে আজগুবি সাহিত্যের সম্মুখ থেকে। যেতে বাধ্য, কারণ আজগুবি সাহিত্য রচয়িতারা এখন আত্মসচেতন, আত্মপ্রত্যয়ী, দ্বিধাহীন; তাঁরা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছেন সাহিত্য-সরস্বতীর ডান ধারে আজগুবি সাহিত্যের কায়েমি আসন। এ সাহিত্য-সৃষ্টির আসরে ভিড় নেই, কারণ বিশ্বকর্মার প্রতিভা তৈরির কারখানা থেকে আজগুবি প্রতিভা খুব বেশী তৈরি হয়ে বেরোয় না, এ প্রতিভার মালমশলা সুলভ নয় বলে।

সাহিত্যে আজগুবিয়ানার শিল্পীদের আজ আর ইনফিরিঅরিটি কমপ্লেকস্ বা হীনতা-বোধ নেই, যা আছে তা শুধু যা তাঁরা দিতে পেরেছেন তার চাইতে আরো অনেক বেশী দিতে পারেন নি বলে বেদনাবোধ—সেই বেদনাবোধই হচ্ছে সত্যিকারের বিনয়। এই সত্যটিকে একজন আজগুবিয়ানার কবি কবিতায় রূপ দিয়ে বলেছেন :

Never shall I say or believe I am nothing worth.
I always know and say I am worth *much.*
Only I feel within my inmost soul
I could have been and should have been worth *much more,*
But been I have not. The unattained difference
Between the *much* and the *much more* sadden my soul—
That is my humility.

উপেন্দ্রনাথ

দীর্ঘ ঊনআশী বছরের যাত্রা অন্তে উপেন্দ্রনাথ লোকান্তরিত হলেন। সেই সঙ্গে বাংলাসাহিত্য ও সমাজের একটা যুগের সমাপ্তি ঘটল। তাঁর জন্ম ১২ই অক্টোবর ১৮৮৯, মৃত্যু ৩০শে জানুআরি ১৯৬০। ভারতের ইতিহাসে বহু যুগান্তকারী পরিবর্তন এই কালপর্বে সাধিত হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য তথা জীবনসাধনায় এর সবক'টি পরিবর্তন চিহ্নিত হয়েছে। বিগত শতাব্দের যে বাঙালী বঙ্গেতর ভারতে জয়যাত্রায় গিয়েছিল, উপেন্দ্রনাথ সেই সুখের ও সমৃদ্ধির দিনকে বালকজীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার প্রমাণ 'স্মৃতিকথা'। আবার স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের যে রঙ্গস্থল কলকাতা, উপেন্দ্রনাথ তাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন, 'স্মৃতিকথায় ও 'রাজপথ' উপন্যাস তার পরিচয়স্থল। সেইজন্য, সুরুচি, ভদ্রতা ও পরিশীলিত জীবনের যে মহিমা প্রমথ চৌধুরী কীর্তন করেছেন ('বই পড়া' প্রবন্ধে), তার মূর্তিমান প্রতিনিধি ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। তাঁর সকল লেখায় এই পরিচয়টি বড় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন—ভারত-গগনের এই তিন উজ্জ্বল রবি চন্দ্র-তারকার অতি ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সৌভাগ্য উপেন্দ্রনাথের হয়েছিল। এবং এই তিন চরিত্রের যে 'ক্লোজ-আপ' তাঁর 'স্মৃতিকথা' ও 'বিগত দিনে' ধরা আছে, তার মূল্য অসামান্য।

একাল ও সেকাল, দুই কালকে যিনি অতি নিকট সম্পর্কে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই উপেন্দ্রনাথ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ে আনন্দ আহরণ করেছেন। বস্তুতঃ এটা আমাদের কাছে খুব আশ্চর্য মনে হয় যে, ঊনআশী বছরের দীর্ঘ জীবনপথে কীভাবে উপেন্দ্রনাথ এই সরসতাকে বজায় রাখলেন? বস্তুত এটাই তাঁর জীবনের সিক্রেট। সদানন্দময় সরসকথালাপী হাস্যোৎফুল্লভাসিত-আনন চিরতরুণ উপেন্দ্রনাথ সকল পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করে অসাধারণ জীবনী-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বর্তমানের পরিবর্তন—দৃষ্টিভঙ্গীর ও জীবনবোধের গুরুতর পরিবর্তন—উপেন্দ্রনাথ অবশ্যই লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তিনি হতাশ হন নি। তিনি বলেছেন, "বহির্বিশ্ব অবশ্য পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যেমন ছিল বস্তুতঃ আজও প্রায় তেমনই আছে। পূর্বের মতোই আকাশে চাঁদ ওঠে, লতায় ফুল ফোটে, পাখী গান গায়, প্রান্তরে ফসল ফলে। কিন্তু মানুষের অন্তর্লোকের কি সংবাদ?—সেখানে ত মনে হয় না সবুজের লীলা চলছে। সেখানে জীবনসংগ্রামে অশুচি হানা-হানি ফলে হৃদয়ের বৃত্তিনিচয়ের মূল্যমান গেছে পালটে। সততা হয়েছে বুদ্ধিহীনতার প্রতিশব্দ, সতীত্ব দাসীত্বের ভদ্র ভাষা। সোনার লালসায় মানুষের চিত্ত লৌহভূমিতে পরিণত হয়েছে। পূর্বে চোদ্দ আনা মূল্যের পিরানের ভিতর যে হৃদয় ত্যাগে-ঔদার্যে উপচিকীর্ষায় স্পন্দিত হত, আজ আশী টাকা মূল্যের কোটের অন্তরালে সে হৃদয় দেউলে।" (বিগত দিন)

এই সততা ও সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ ও ঔদার্য, বন্ধুতা ও উপচিকীর্ষা, গভীর সাহিত্যপ্রেম ও

সূক্ষ্ম রুচি ঃ এই নিয়েই যে মানুষটি গঠিত, তিনিই উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাস-গুলিতে যে-সব মানবিক গুণের জয়ঘোষণা করা হয়েছে, তা এই দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত। বিগত-কালের প্রতিনিধি উপেন্দ্রনাথ আজকের রিক্তবিশ্বাস হৃদয়হীন কথাসর্বস্ব চাতুরিভরা জীবনে একটি স্নিগ্ধ সরস ভদ্র ব্যক্তিত্বের আধার ছিলেন। তাঁর কর্মে ও বাচনে, ব্যবহারে ও রচনায় এই ব্যক্তিত্বটি পরিস্ফুট। ১৯১২ থেকে ১৯৫৯—একটানা কিঞ্চিন্ন্যূন অর্ধশতাব্দীব্যাপী প্রসারিত উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনার মূল্য এইখানে যে, তা আমাদের জীবনকে ভদ্র শান্ত সরস করে গ্রহণ করতে শেখায়। গভীর চিন্তা, সংযত প্রকাশভঙ্গি, লঘু সরসতা, সহজ ভদ্রতা, সাবলীল মধুর সংলাপ, সর্বোপরি মার্জিত রুচি উপেন্দ্র-কথাসাহিত্যকে এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী করেছে। জীবনের গভীরতর আঘাতকে শান্ত মনে গ্রহণ করার সহজ শক্তি উপেন্দ্রনাথের ছিল, তৎসৃষ্ট চরিত্রগুলিরও ছিল। এই শক্তির উৎস ঐ আনন্দ আহরণের সুপ্রচুর ক্ষমতা ও নৈপুণ্য। সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ ও সামাজিক উপেন্দ্রনাথ—এই দুই উপেন্দ্রনাথ এক অচ্ছেদ্যসূত্রে বাঁধা। সে সূত্র জীবনশিল্পী উপেন্দ্রনাথ। বর্তমান বিশ্বশক্তির হৃদয়হীন ছলনাময় পর্বে আমরা তাঁকেই প্রত্যক্ষ করেছি।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

আলবেয়ার কেমু স্মরণে

আলজেরিয়ার একটি গরীব ক্ষেত-মজুরের ঘরে আলবেয়ার কেমুর জন্ম হয়। বাবা ফরাসী কিন্তু মা ছিলেন স্পানিশ। কেমুর জন্মের বৎসর খানেক পরেই যুদ্ধক্ষেত্রে কেমুর বাবা মারা যান। সাংস্কৃতিক-গর্বে গর্বিত ফরাসী-সমাজে কেমুদের স্থান ছিল অনেকটা বর্ণশঙ্করের মত। এই অনাথ শিশুর বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের প্রথম অধ্যায় অমানুষিক দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই অনাথ শিশু ফরাসীদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন।

ফরাসীদের সঙ্গে বাঙালীদের একটি অদ্ভুত মিল দেখতে পাওয়া যায়। বাঙালীদের মতই ফরাসীরা সীমাহীন অহমিকাবোধের অধিকারী। অপরাপর ব্যক্তিদের অপেক্ষা নিজেদের যখন কেউ শ্রেষ্ঠ মনে করে, তখন অপরের কাছ থেকে কোন জিনিস শিখবার আছে বলে মনে না করাই নিয়ম। বৎসরের পর বৎসর এই মনোভাব যদি কোন জাতিকে পেয়ে বসে তবে সে জাতি নিজের অহমিকাটুকুও শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারে না। অহমিকাবোধই অপরের কাছ থেকে কোন কিছু শিখতে বাধা দেয়। আর অপরের কাছ থেকে যখন শিখতে অস্বীকার করে, তখন প্রতিযোগিতায় সে জাতি ক্রমাগত পিছনের দিকে সরে আসতে বাধ্য হয়। অতীতে অনেক দেশ, অনেক জাতি নিজেদের অবদানে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করলেও অনেকক্ষেত্রে সে দেশ বা সে জাতিকে এই কারণেই পিছনের সারিতে স্থান করে নিতে হয়েছে। ফরাসীরা নিজেদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতার উত্তরাধিকারী মনে করেও কিন্তু চিন্তা এবং বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে আজও পৃথিবীতে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। সমস্যার এই আপাত বিরোধিতার কারণ ফরাসীদেশের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজতে হবে।

কোন সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হলে একদিকে যেমন অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করতে

হয়, তেমনি অপরদিকে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করতে হয়। সমাজে ক্ষমতা, চিন্তা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির মইয়ে যাদের স্থান উপরে, তাদের উপরেই প্রতিটি দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যত নির্ভর করে। তবে কোন সমাজ নিজেকে প্রাণবন্ত রাখতে পারবে কিনা এবং পারলেও কতখানি পারবে, তা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে না। সমাজের নীচু থেকে উপরে উঠবার সুযোগ এবং প্রতিযোগীদের সংখ্যার উপরেই তা নির্ভর করে। অনেক দেশে বা সমাজে বিশেষ বর্ণ, বিশেষ ধর্মাবলম্বী বা বিশেষ জাতির লোকদের সামনেই একমাত্র উপরে উঠবার বা উপরে প্রাপ্ত আসন বজায় রাখবার সুযোগ উন্মুক্ত থাকে। এ ধরনের অবস্থা যে সমাজে বিরাজ করে,সে সমাজকে গতিশীল রাখা সম্ভব নয়। কারণ কৃত্রিমভাবে সমাজে এদের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্য প্রতিযোগীদের সংখ্যা খুবই কম নয়। বিশেষ একটি গোষ্ঠী থেকে সবাই আসছে বলে অভিজ্ঞতাও ব্যাপক হওয়ার কথা নয়। নিজেদের আসন বজায় রাখবার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম করা দরকার, তার বেশী এরা সচরাচর কিছু করে না। এ কারণে কোন ঝুঁকি নেওয়াও এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে সমাজের নীচের তলায় যারা অবস্থান করছে তারাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে বেশী ঝুঁকি নিতে পারে। তাদের বিচিত্র পরিবেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা-জনিত অবদান সমাজের জীবনযাত্রা এবং চিন্তাধারার মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে থাকে। যে সমাজ কৃত্রিম বিধি-নিষেধ বা আচরণের দ্বারা প্রতিযোগীদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিটি ব্যাপারে সমাজের নীচের তলার ব্যক্তিদেরও প্রতিযোগিতা করতে শুধু উৎসাহ নয়, সুযোগও করে দেয়, সে সমাজ দীর্ঘদিন ধরে প্রাধান্য বজায় রেখে থাকে। একথা শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রাজনৈতিক ক্ষমতাও বিশেষ জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেও তার পরিণামও সুফল হয় না। এখানে আলেক-জান্ডরের গ্রীক-সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুর্কী-সাম্রাজ্যের তুলনামূলক আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আলেকজান্ডার যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর পরেই ছত্রখান হয়ে যায়। কারণ শাসনকার্যে একমাত্র গ্রীকদেরই দেখা যেত এবং নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হত না। অল্প সংখ্যক প্রতিযোগীদের পরিবেশও ভিন্ন না হওয়ায় প্রতিযোগিতার মধ্যেও তেমন তীব্রতা পরিলক্ষিত হয় নি। পরিবেশ পরিচিত হওয়ায় প্রতিপক্ষের সব কিছুই প্রায় জানা থাকে। এসব কারণে গ্রীকদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দক্ষ করবার কোন সুযোগও থাকে নি। অপরপক্ষে তুর্কীরা নিজেদের প্রশাসনিক যন্ত্রে বেছে বেছে কর্মঠ এবং বুদ্ধিমান খৃষ্টান যুবকদের রিক্রুট করত। ফলে তুর্কী যুবকদের সব সময় তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হ'ত। প্রতিযোগীদের সংখ্যা বৃদ্ধিই তীব্র প্রতিযোগি-তার একমাত্র কারণ নয়। প্রতিযোগীদের ভিন্ন পরিবেশ ও প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ার কারণ। ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অনেক বেশী সতর্ক হতে হয়। কোন দিক থেকে পরাজয় আসতে পারে তা আগে থাকতে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কারণ তার সব কিছুই তো অজানা। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য জানতে তো হয়ই, এমনকি প্রয়োজনমত আত্মসাৎও করতে হয়। তুর্কী সাম্রাজ্যে দীর্ঘদিন দক্ষ-শাসনযন্ত্রের অস্তিত্বের এটাই প্রধানতম কারণ।

ইংরেজ এবং ফরাসীরা সম্ভবতঃ তুর্কীদের কাছ থেকে তাদের জাতীয়-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। ইংরেজ এবং ফরাসীরা নিজেদের শাসনব্যবস্থায় পরাধীন জাতের লোকদের নিয়োগ করে থাকে। নিজেদের জাতের লোকদেরও পরাধীন দেশের লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা

করতে হয়। এই ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নিজেদের চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রেখে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সম্ভব। তবে ইংরেজ এবং ফরাসীদের মধ্যে একটি পার্থক্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে অন্যান্য জাতি নিজেদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিকে উন্নত করেছে কিন্তু ইংরেজদের সাংস্কৃতিক জীবনে প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশের কোন সুযোগ তারা লাভ করে নি। পক্ষান্তরে ফরাসীদের সংস্পর্শে এসে ভিন্ন জাত এবং ভিন্ন সংস্কৃতির লোকেরা ফরাসী সংস্কৃতিতে অবগাহন করবার সুযোগ পেয়েছে, মনে প্রাণে ফরাসী হতে পেরেছে, ফরাসী সমাজে নিজে ফরাসী না হয়েও অন্য ফরাসীর মত একই পর্যায়ে ভাবতে পেরেছে কিন্তু নিজেদের পূর্বতন সমাজ এবং সংস্কৃতিকে ভুলে যেতে হয়েছে। ব্যাপারটি অ-ফরাসীর সমাজ এবং সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকর হলেও ফরাসীদেশ, তার সমাজ এবং সভ্যতা এর দ্বারা লাভবান হয়েছে।

মানুষের উপর পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। মা, বাবা, ভাই-বোন এবং আত্মীয় পরিজনেরা ছেলেদের উপর শৈশব থেকে যে প্রভাব বিস্তার করে, পরবর্তীকালে সে প্রভাব অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার নয়। একজন কি পরিমাণ আবেগপ্রবণ বা চিন্তাশীল হবে, শৈশবেই তা মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়। বাড়ীর পরিবেশ ছাড়া স্কুল এবং বাড়ীর বাইরের পরিবেশ ও তার চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই সব কারণে নীচের তলার লোকেরা জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাধান্য অর্জন করলেও চিন্তাধারা বা বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের দিক থেকে সব সময়েই পিছিয়ে থাকে। বিশেষ পরিবেশে জন্মের জন্য যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, পরবর্তীকালে শিক্ষা এবং জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে সেই অসুবিধা দূর করে ব্যক্তির বিকাশের পথকে অনেকটা সুগম করে দেওয়া যায়। এই বিশেষ ব্যবস্থার কল্যাণেই সমাজের নীচের তলার ছেলেদের উপরে ওঠা সম্ভব হয়। যেখানে এ সুযোগ রয়েছে, সেখানেই সামাজিক পরিমণ্ডল বিষাক্ত হয়ে যায় না, সামাজিক-মনও দেউলিয়া হয়ে হতাশার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সামাজিক গতিশীলতা বজায় রাখতে পারলেই সমাজকে প্রাণবন্ত রাখা যায়। ফরাসীদেশে এই বিশেষ সুযোগগুলি থাকবার জন্যই অত্যন্ত দরিদ্র এবং অবহেলিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও আলবের কেমু ফরাসী সমাজের উপরের দিকে উঠতে পেরেছিলেন। ফরাসীদেশে প্রতিটি ব্যক্তির সামনে যে সুযোগ রয়েছে, বাংলা দেশে তা দিতে কতযুগ লাগবে কে জানে!

দক্ষিণ-আফ্রিকায় আইন করে যেভাবে শ্বেতাঙ্গদের প্রতিযোগীদের সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছে, যে ধরনের অসভ্যতা ভারতীয় যুক্তরাজ্যে কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকা বড় কথা নয়। যাতে ভালভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারে, তারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। অনুন্নত সম্প্রদায় বা শিক্ষায় অনগ্রসরদের চাকুরী এবং অন্যান্য অনেকক্ষেত্রে অনুগ্রহ করা হয়। কিন্তু অনুগ্রহ নয়, পিছিয়ে থাকা পরিবেশের প্রভাব যাতে অতিক্রম করে অপরাপর ব্যক্তিদের সঙ্গে সম-ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা করতে পারে তার জন্য পরিবেশের পরিবর্তনের দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সামান্য অধিকার দানের চেয়ে উপরে উঠবার সুযোগ করে দেওয়া বেশী গুরুত্বপূর্ণ। নীচু থেকে দুই একজন ব্যক্তি উপরে ওঠে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন কিন্তু চিন্তা বা বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে তাদের দৈন্যও পীড়াদায়ক। এদের কাছ থেকে কোন প্রতিযোগিতা না হওয়াও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার দৈন্যের একটি কারণ। এক পিছিয়ে-থাকা মুসলমান পরিবারে নজরুল ইসলামের জন্ম হয়েছিল। বিষয় এবং

ছন্দ-বৈচিত্র্যের গুণে তিনি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চিন্তার দৈন্য তিনি ঘুচাতে পারেন নি। উন্নত সাংস্কৃতিক পরিবেশে অবগাহন করবার যে সুযোগ কেমুর ছিল, নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে তা স্বভাবতঃই ছিল না। এই সামাজিক গতিশীলতার অভাব বাংলা দেশের পক্ষে শুভ হয় নি। নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিলেন, আরও অনেক নজরুল ইসলাম হওয়ার সুযোগ করে দিতে না পারায় বাংলা সাহিত্যে অজস্র বৈচিত্র্যের ধারা সৃষ্টি করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি কিনা কে জানে! সামাজিক গতিশীলতার অভাব বাঙালী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৈন্যের একটি প্রধানতম কারণ।

নিরঞ্জন হালদার

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

গান শোনা প্রসঙ্গে

বেশী লোক গান বাজনা করেনা একথা সত্যি কিন্তু শোনে অনেকেই। সমঝদারীর ভিত্তিতে গান বাজনার একটি বিভাগের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন,—ক্লাশিকাল, আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ভজন, পল্লীগীতি ইত্যাদি। এই বিভেদটি খুব পরিষ্কার না হলেও এরই ভিত্তিতে শ্রোতাদের মধ্যেও একটা বিভাগ হয়েছে। সেই সঙ্গে একশ্রেণী গানের প্রতি আর এক শ্রেণী গানের শ্রোতা প্রায়ই সহনশীল হন না এটা প্রায়ই চোখে পড়ে। গানের আবেদন যখন সার্বজনীন তখন এই বিভেদের মধ্যে কোনও যুক্তি আছে কিনা এটা বিচার করে দেখা দরকার।

প্রত্যেক শিল্প সমঝদারীর ভিত্তিতে মোটামুটি দু'টি বিভাগে বিভক্ত। সৌন্দর্যবোধের প্রথম দিকটি হল আবেগ বা ইমোশানের দিক আর একটি হল বুদ্ধির বা ইণ্টেলেকচুয়াল দিক। সঙ্গীতকর্মের মালমশলা, যা দিয়ে সঙ্গীতের গঠন, সেগুলি মানব সমাজের স্বভাব উদ্ভূত, তার প্রয়োগ প্রক্রিয়ার ভিত্তিও মূলতঃ সার্বজনীন কিন্তু, স্থান কাল ও পাত্রভেদে প্রয়োগ কৌশল বা টেক্‌নিকের মধ্যে বিভেদ দেখা যায়। সেই কারণে সমঝদারীর বিভেদ হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু গান শোনার প্রক্রিয়াটি সঠিক ভাবে বুঝলে এই বিভেদ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। শিল্পীর স্ফুরণ নিজেকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দেবার জন্যে। তার সঙ্গীত সৃষ্টি ততই সার্থক হবে যত সার্বজনীন হবে।

জনসাধারণের সঙ্গীত সমঝদারীর প্রথম হল স্বর-মাধুর্যের আবেদন। দ্বিতীয় হল সঙ্গীতের উদ্দীপনা, তৃতীয়ত,—সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি।

স্বরমাধুর্যের আবেদন একান্তই স্বভাবধর্মী। কর্কশ বা মধুর স্বর,—রাসভ বা কোকিল কণ্ঠ, —এর বিভেদ বোঝবার জন্য সকলের কানই তৈরী আছে। এর জন্য সঙ্গীত শাস্ত্রের শব্দ-বিজ্ঞান পড়বার প্রয়োজন হয় না। গান না শুনলেও কানে সুমিষ্ট ধ্বনিই শ্রবণ মধুর। গল্প করতে বসে রেডিও খুলে মিষ্টি আওয়াজ শুনলে বিশেষ অসুবিধা হয়না বরং ভালই লাগে, যদিও একে গান শোনা বলা চলে না মোটেই। সারাদিনের কাজকর্মের পর খবরের কাগজ নিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে যিনি "রিল্যাক্স" করবার জন্যে রেডিও খুলে বসেন তিনি আর যাই করুন গান যে শোনেন না একথা ঠিক। বোধকরি তিনি রেডিওর ওই মধুর আওয়াজেই সন্তুষ্ট। মন-দিয়ে গান শুনতে হলে অথবা সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে গেলে সঙ্গীত-কর্মের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করা দরকার।

শ্রোতামাত্রেই সঙ্গীতের মধ্যে উদ্দীপনাটুকু অনুভব করতে চান। কি সংবাদ বহন করছে সেই সঙ্গীত, কোন রস সেই সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে উদ্ভূত হচ্ছে এইটিই হল সেই সঙ্গীতকর্মের উদ্দীপনা। অনেকেরই ধারণা যে সঙ্গীত মাত্রেরই তার উদ্দীপনা সকল সময়ে সমান ও সার্ব-জনীন। এই ধারনার বশবর্তী হয়েই ভূয়া-ওস্তাদরা ক্লাশিকাল রাগ সঙ্গীতের কাল নির্ণয়ের কড়াক্কড়ি করেন। ভারতীয় রাগসঙ্গীতকে রসবিচারের ভিত্তিতে ভাগ করেন। আসলে রাগ-সঙ্গীত হল রঞ্জন শক্তি ভিত্তিক। কোনও বিশিষ্ট রাগ বা রাগিণী, স্বর-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যে

মনোরঞ্জন করে বটে কিন্তু তাতে রসারোপ করা শিল্পীর কাজ। শিল্পী গতানুগতিক ধারনার বশবর্তী হয়ে রাগ রাগিণীর কাল বা রসের নির্দ্দেশ মেনে চলার ফলেই আজ রাগসঙ্গীত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, রাগ রাগিণীর ব্যবহার করেও যে সব সঙ্গীত রচয়িতা এই নির্দ্দেশ মেনে না চলে সুস্থ সঙ্গীতমনস্কতা তাঁদের রচনার ভিতর দেখিয়েছেন তাঁরাই "সঙ্গীত বিদ্রোহী" আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন। এই সমস্ত তথাকথিত বিদ্রোহীদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং অপেক্ষাকৃত "আধুনিক" সঙ্গীত রচয়িতারা।

যাই হোক কি সঙ্গীত শিল্পী কি রচয়িতা, বাজনায় বা গানের ভিতর দিয়ে সব সময়েই একটি উদ্দীপনা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। উদ্দীপনার বিষয়টি যতই পরিস্ফুট হয় সাধারণের পক্ষে সেই সঙ্গীতকর্মটি ততই গ্রহণযোগ্য হয় একথা সত্যি হলেও সেইটিই যে উৎকৃষ্টের নিদর্শন তা' ঠিক নয়। যদি তাই হোত তাহলে কণ্ঠসঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীতের চেয়েও প্রিয়তর বলা যেত কেননা ভাষার সাহায্যে তার উদ্দীপনা প্রকাশের সুবিধা বেশী। একই সঙ্গীত একই সময়ে বা ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রোতার কাছে বিভিন্ন রসের সঞ্চার করে। শিল্পী ও শ্রোতা ভেদে এই রসের তারতম্য হয়। সুতরাং সঙ্গীত মাত্রেরই একটা উদ্দীপনার আবেদন থাকলেও সেটি যে কি সে কথা বলা কঠিন। এবং কোনও বিশেষ উদ্দীপনা প্রচারের উদ্দেশ্যে সঙ্গীত রচনা বা পরিবেশন সহৃদয় শিল্পীর হাতে না পড়লে বিকৃত হয়ে পড়ে।

সঙ্গীত মাত্রেরই একটা সাঙ্গীতিক ভাষা আছে। সেই ভাষা সঙ্গীতের সৌন্দর্য প্রকাশ করে। কোনও বিশেষ উদ্দীপনা প্রকশের উদ্দেশ্য না নিয়ে যিনি রচনা করেন বা উপভোগ করেন এটি তাঁদের ভাষা। নিছক সঙ্গীতের আবেদন এটি,—এক কথায় মোহিনীশক্তি। মোহিনী শক্তির আবেদন মনের গভীর অন্তঃস্থল স্পর্শ করে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য সুধায় ভরিয়ে দেয়।

এই তিনটি পর্যায় আলাদা করে বর্ণনা করলেও আসলে প্রকৃত শ্রোতার কাছে সমস্তটি একটি সম্পূর্ণ আবেদন। গান শুনতে বসে এর যে কোন দিকটি আলাদা করে নিলে গান শোনা প্রকৃত হবে না। এর ভেতরে কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে প্রস্তুতি দরকার। বিশেষ করে সুরের মাধুর্য বুঝতে গেলে সুরের কাঠামোগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। গান শোনবার সময় এই কাঠামোর সঙ্গে সর্বদা যাতে একটা সংযোগ রাখা যেতে পারে তার জন্যে কান তৈরী করতে হবে। কেবল মাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে গান করাও যেমনি অসম্পূর্ণ গান শোনাও তাই। গান শুনতে হলে মন ও বুদ্ধি দুইই প্রয়োগ করতে হবে।

সমস্ত বিষয়টা পরিষ্কার করে বলতে যতটা সময় লাগলো গান শোনার প্রক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু ততটা সময় ভাবতে হয়না। গান শোনার মূল সূত্রটি হল মন নিবিষ্ট করা। যে কোনও শ্রোতার পক্ষেই তাহলে যে কোনও গান শুনতে অসুবিধা হবেনা। "ওস্তাদী" গান না জানলে "ওস্তাদী" গান উপভোগ করা যাবেনা একথা যেমন মিথ্যে তার উল্টোটাও তেমনি সব সময় সত্যি নয়। আধুনিক গান বা অন্যান্য গান রসিক সমাজে উপভোগ্য নয় একথা যত সমালোচকই জোর গলায় বলুন না কেন তার সবটাই সত্যি হতে পারে না। সঙ্গীত মাত্রেরই ভালমন্দ অবশ্যই থাকবে। মন্দ সঙ্গীতের রচনা পদ্ধতি হয়ত রঞ্জনকারী না হতে পারে সেটি সেই বিশিষ্ট রচনার দোষে। সমস্ত আধুনিক গানকে খারাপ আখ্যা দেওয়া বা সমগ্র "ওস্তাদী" গানকে উচ্চ আসন দেওয়া নিতান্তই অন্ধপক্ষপাতিত্ব।

সঙ্গীতকর্মের তিনটি দিক আছে। প্রথম হল রচয়িতা, দ্বিতীয় হোল পরিবেশনকারী শিল্পী এবং তৃতীয়তঃ শ্রোতা বা সমঝদার। আমাদের ক্লাশিকাল সঙ্গীতে শিল্পীই প্রকৃতপক্ষে রচয়িতা। রাগসঙ্গীতের কাঠামোগুলি শিল্পীর প্রয়োগকালের অনেক আগের থেকেই তার

সঙ্গীতমন্যতার মধ্যে বর্তমান থাকে। প্রয়োগ মুহূর্তে তার রূপ যেভাবে এসে পড়ে শিল্পী তার প্রকাশক্ষমতার সাধ্যমত প্রয়োগ করে থাকে। সঙ্গীতপণ্ডিত (সোফিস্টিকেটেড্) শিল্পী তার অর্থীত বিদ্যা দিয়ে তার প্রয়োগকে সংহত করে। কেবলমাত্র সঙ্গীতমন্যতা (মিউসিকাল সেন্স)-কে মূলধন করে যে সঙ্গীত রচনা করে বা যে শিল্পী প্রয়োগ করে তার বিচার একমাত্র সহৃদয় সমঝদারই করতে পারে। তার জন্যে সঙ্গীতবিজ্ঞান তোলা থাকলেও ক্ষতি নেই। "মাইকে" ঘোষণা করে দেবার পর শিল্পী যখন খাম্বাজ রাগে গান সুরু করেন সঙ্গীত পণ্ডিত শ্রোতা তখন সেই রাগের বাদী, বিবাদী, আরোহী, অবরোহী ও পকড় সঙ্গীত ব্যাকরণ মত হচ্ছে কিনা তাই মিলিয়ে দেখেন। সাধারণ শ্রোতা তখন তাঁদের সঙ্গীতমন্যতার আবেগ দিয়ে যদি গান শোনেন তাতে সমঝদারীর তারতম্য হবে কেন? রাগটি খাম্বাজ একথা না বুঝলেও তার সৌন্দর্যটুকু নিশ্চয়ই বোঝা যাবে।

আসলে সমঝদারীর তারতম্য হয়েছে সঙ্গীতের জাতিভেদের মাধ্যমে। বিলায়েৎ হোসেন খান যখন সেতার নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জলসায় "ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি" গানটি বাজান তখনই সেই গানটি জাতে ওঠে নইলে ওটি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং উচ্চাঙ্গ আসরে অপাংক্তেয়।

গান শোনার পদ্ধতি বা সমঝদারীর পদ্ধতি সার্বজনীন। যে ধরনের সঙ্গীতই হোক না কেন সমঝদারীরকষ্টিপাথরটি একই,—ভাল লাগা। সঙ্গীত ভাল লাগা নির্ভর করে মনদিয়ে শোনার ওপর। সেই মন দেবার চাবিকাঠিটি খুঁজে বের করাই হল প্রকৃত শ্রোতার কাজ। বুদ্ধির কাজ শুধু এইটুকু।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

নাটক না ম্যাজিক

বাংলার নাট্যআন্দোলনে নতুন জোয়ার এসেছে এ কথা অনেকেই বলছেন। দিনের পর দিন ধরে পেশাদার মঞ্চে একই নাটকের অভিনয়, বিভিন্ন স্থানে নাট্যোৎসব, নাটক প্রতিযোগিতা, অবৈতনিক সম্প্রদায়ের নতুন নতুন নাটক অভিনয়ের চেষ্টা, একাঙ্কিকা নাটক অভিনয় ও প্রতিযোগিতা, একাঙ্কিকা নাটক সঙ্কলনের প্রকাশ ইত্যাদি সেই ধারণারই সমর্থন করছে। সত্যিই মনে হচ্ছে যে বাংলার নাট্যামোদী জনসাধারণ বঙ্গরঙ্গমঞ্চের নিভু নিভু প্রদীপের সলতেগুলো উস্‌কে দিয়েছেন। এটা আশার কথা।

কিন্তু আশংকার কথাও আছে। উৎসাহের প্রাবল্যের এই বেগ বাংলা নাটককে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যে সব নতুন নতুন যান্ত্রিক কলাকৌশলের সমাবেশ বর্তমানে নাটকের মধ্যে চলছে তাতে ভবিষ্যতে মঞ্চসজ্জা ও বৈদ্যুতিক কারিগরীর বাহাদুরী যিনি যত বেশী করতে পারবেন সেই প্রযোজকই ততবেশী নতুনত্বের স্রষ্টা বলে বাহবা পাবেন। ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যেদিন একজন ইলেকট্রিসিয়ান নাটক লিখবেন—সে নাটকে সংলাপ-অভিনয়-চরিত্র সব হবে গৌণ, প্রধান নায়ক ইলেকট্রিক কারেন্ট।

এ আশংকা আমার অমূলক নয়। আজকাল প্রযোজকদের মধ্যে নানান পরীক্ষানিরীক্ষার ঝোঁক দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে পেশাদার মঞ্চের প্রযোজকদের। নাটকের দুর্বলতা তাঁরা ঢাকতে চাইছেন মঞ্চসজ্জা আর অন্যান্য যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগ কোরে। তার মধ্যে বিদ্যুতের ব্যবহারটাই সবচেয়ে বেশী।

একথা অবশ্যস্বীকার্য যে মঞ্চসজ্জা ও আলোকক্ষেপণ সুষ্ঠু হলে নাটকের সামগ্রিক আবেদন বৃদ্ধি পায় আর ওগুলো না হোলে অনেক সময় রসহানি ঘটে।

এবার আমার আশংকার ভিত্তি কোথায় সেকথা আলোচনা প্রসংগে উল্লেখ করব বর্তমানের চলতি দুখানি নাটকের। একটি 'সেতু' অপরটি 'অংগার'। এই দুটি নাটক দেখতে গিয়ে দেখলাম নাটকের প্রধান ব্যক্তি নাট্যকার নন, কোন শিল্পী নন, প্রধান অংশে আছেন আলোকসম্পাতকারী। দুটি নাটক দেখে দর্শকরা যখন হতবাক হয়ে ঘরের দিকে ফিরতে থাকেন তখন তাঁদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে ইলেকট্রিকের যাদু। নাটক দেখতে গিয়ে যদি শুধু ইলেকট্রিসিয়ানের কেরামতিটাই বড় হোয়ে ওঠে চোখের কাছে তাহলে নাট্যকার ও শিল্পি কারোর পক্ষেই সেটা গৌরবের কথা নয়! সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা যে 'অংগার' অভিনয়ের শেষে যখন প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এলাম মনে হোল যেন বহুদিন আগে নিউ এম্পায়ারে পি. সি. সরকারের ম্যাজিকের শেষ খেলা সেই সারা ঘর অন্ধকার করে ভূত নাচানোর দৃশ্যের অনুভূতি রয়েছে আমার মনে। অবিকল এক। অংগারের শেষ দৃশ্যে সারাঘর অন্ধকার করে জলে খাদডোবানোর যে দৃশ্য কর্তৃপক্ষ দেখিয়েছেন তাতে অভিনয় অংশ গৌণ, প্রধান কৃতিত্ব ইলেকট্রিসিয়ানের।

'সেতু'র সম্বন্ধেও ওই এক কথা। অত্যন্ত দুর্বল, অবাস্তব ঘটনাপূর্ণ একটি নাটকের সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য একটি মাত্র দৃশ্য। নায়িকার ট্রেনে চাপা পড়তে যাওয়ার দৃশ্য। এখানেও একটা ম্যাজিক দেখার অনুভূতি থাকে মনে। নাটকের অন্য কোন কথাই মনে থাকে না। সব বক্তব্য ছাপিয়ে আলোকসম্পাতকারীই প্রধান হোয়ে ওঠেন।

আলোকসম্পাতকারী সত্যিই অসাধারণ গুণী। রংগমঞ্চের একটি দিকে তিনি প্রাণসঞ্চার করেছেন একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু নাটকের দিক থেকে এটা আশার কথা নয়। এই প্রসংগে একটা কথা বলবো। কিছুদিন আগে বংগসংস্কৃতি সম্মেলনে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয়-সমৃদ্ধ সধবার একাদশী দেখেছিলাম, তারও আগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মাঠে শ্রীশম্ভু মিত্র পরিচালিত ছেঁড়াতারের অভিনয় দেখেছিলাম। উভয়ক্ষেত্রেই মঞ্চসজ্জা অত্যন্ত সামান্য। আলোক-সম্পাত নগণ্য। দর্শক প্রায় দশহাজারের ওপর। কিন্তু সেই দশহাজার দর্শককে দেখেছি মন্ত্র-মুগ্ধের মত চুপ করে বসে অভিনয় দেখতে। অভিনয় শেষে তাঁরা যখন ফিরে যাচ্ছিলেন দেখেছিলাম তাদের মুখভরা পরিতৃপ্ত। কোন নাটক দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ইলেকট্রিসিয়ানের প্রশংসা গাইতে গাইতে ঘরে ফিরছিলেন না তাঁরা। নাটক দেখে, নাট্যকার ও শিল্পীদের প্রশংসায় তাঁরা মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

তাই বলছিলাম, নাটক বলতে শুধুমাত্র যান্ত্রিক কলাকৌশলকে যদি প্রাধান্য দেওয়া হয় তাকে নাটক নাম না দিয়ে ম্যাজিক বলা ভালো নয় কি? যন্ত্রশিল্প বা বৈদ্যুতিক কেরামতি দেখবার জন্যে আমাদের মঞ্চগৃহে না গিয়ে যাদবপুর বা শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রদর্শনীতে যাওয়াই ভালো।

নাটকের স্রষ্টা ও প্রয়োগকর্তাদের কাছে তাই আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন এই কথাটা সর্বদা মনে রাখেন যে নাটক মানে চোখ ধাঁধানোর কিছু নয়। নাটক মন ভরানোর বস্তু। নাটক হোল নরমতুলি দিয়ে দর্শকের মনের ক্যানভাসের ওপর রংএর সূক্ষ্ম প্রলেপ—মিস্ত্রির হাতুড়ি দিয়ে তাদের মগজে দুমদাম ঘা মারা নয়।

প্রকাশ পাল

স মা লো চ না

সাহিত্যের পথে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী। দাম ৩·৩০ টাকা

ইতিপূর্বে সমকালীনের পাতায় রবীন্দ্রনাথের দুএকটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা আলোচনার সবচেয়ে বড় সুবিধে এই যে বইটা কেমন হয়েছে, পাঠকরা এ বইয়ের দ্বারা উপকৃত হবেন কিনা, এ বইয়ের প্রচার হওয়া উচিত কিনা এসব কথা বলার কোন দায়িত্ব থাকে না। তাঁর রচনা আপন গৌরবে এতই সমুজ্জ্বল যে আমার মতো সমালোচকের অপেক্ষা সে রচনার কোনকালেই ছিলনা; আমার চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো রথী মহারথী তাঁর গ্রন্থালোচনার অবকাশে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করেছেন। সেই মহাজন নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত না হওয়াই আমার পক্ষেও বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

'সাহিত্যের পথে' বইটি আমার আলোচ্য বিষয়। এ বইয়ে কি আছে তা নিশ্চয়ই কোন পাঠক এই সমালোচনা পড়ে জানতে চাইবেন না। সুতরাং আমার কর্তব্য সংক্ষেপ হয়েছে। 'সাহিত্যের পথে' রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ও গভীর চিন্তার ফসল। তার সবটার সঠিক হিসেব দেব সে ঔদ্ধত্য আমার নেই। আমি এখানে লেখকের কয়েকটি মন্তব্যকে বিশেষ করে পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চাই। তাঁরই রচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করে আমার কথা জুড়ে দেব।

আধুনিক যুগটা হলো ভীড়ের যুগ। কোন কাজ একলা বসে শান্তিতে করার উপায় নেই। যাই করতে যান তা লোকচক্ষের সামনে আসবে—তার নিন্দা প্রশংসা হবে—খবরের কাগজে হৈচৈ হবে—সভায় কৌতূহলী দৃষ্টির কৌতুকের বস্তু হতে হবে। যুগের এই ভীড়-প্রবণতা সম্বন্ধে কবি বলেছেন বর্তমান কালে আমরা বড়োবেশি লোকচক্ষুর গোচরে। আর পঞ্চাশ বছর পূর্বেও এত বেশি দৃষ্টির ভীড় ছিল না। তখন আপন মনে কাজ করবার অবকাশ ছিল, অর্থাৎ কাজ না করাটাও আপন মনের উপরই নির্ভর করতো, হাজার লোকের কাছে তার জবাবদিহি ছিলনা·····জনসভার ঠাসা ভিড়ের মধ্যে এসে পড়া গেছে। পাশ কাটিয়ে চুপি চুপি সরে পড়বার জো নেই। ঘরজোড়া বহু চক্ষুর ভর্ৎসনা এড়াবে, সাধ্য কার?" (পঞ্চাশোধর্ম—১৩৩৬) এই প্রচণ্ড ভীড়ের দাপটে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আরও দশটা সভা সমিতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সম্মেলনও সুরু হয়ে গেছে। সভায় সভায় সাহিত্যিকরা জড়ো হচ্ছেন; তাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করেই যদি থামতেন তাহলে কিছু বলবার ছিলনা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য কেমন হবে, কি নীতি হওয়া উচিত সে সব কথাও ঐ সম্মেলনে আলোচিত হচ্ছে। মনে মনে হতে পারে আপাততঃ যে তাতে দোষটা কি? দোষ কিছু নেই—একটা অসুবিধা দেখা দেয়। সেটা এই যে সভাসমিতির বা বহুজনের নির্ধারিত মতামতগুলি সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে আসর জাঁকিয়ে বসে। সেই মতামতের প্রভাবে সাহিত্যের সুর একরকা হয়ে যেতে পারে। এবং পৃথিবীর কোথাও কোথাও যে হচ্ছে তাও তো আজ আর অজানা নয়।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্যটি শোনা যাক তারপর আমাদের আলোচনায় ফিরে আসা

যাবে। 'সাহিত্যসমালোচনা'য় বলছেন "দল বেঁধে সাহিত্য হয়না। সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র সৃষ্টি যা মানুষ একলাই করেছে। যখন সেটা দল বাঁধার কোঠায় গিয়ে পড়ে তখন সেটা আর সাহিত্য থাকেনা" 'সাহিত্যরূপে' বলছেন—

"সাহিত্যের মতো দলছাড়া জিনিষ আর কিছু নেই। বিশেষ একটা চাপরাশ পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। কোনো একটা চাপরাশের জোরে যে সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার গৌরব খুব চড়া গলায় প্রমাণ করতে দাঁড়ায়, জানব তার গোড়ায় একটা দুর্বলতা আছে। তার ভিতরকার দৈন্য আছে বলেই চাপরাশের দেমাক বেশী হয়।"

'সাহিত্য বিচারে' বলছেন "সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত; শ্রেণীগত নয়। এখানে 'ব্যক্তি' শব্দটাতে তার ধাতুমূলক অর্থের উপরেই জোর দিতে চাই। স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র।"

আর সবচেয়ে স্পষ্ট করে ও আবেগের সঙ্গে বলেছেন 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে—"সাহিত্য ব্যাপারে সম্মিলনীর কোন প্রকৃত অর্থ নেই। পৃথিবীতে দশে মিলে অনেক কাজ হয়ে থাকে, কিন্তু সাহিত্য তার অন্তর্গত নয়। সাহিত্য একান্তই একলা মানুষের সৃষ্টি। ···বাংলা সাহিত্য যদি দলবাঁধা মানুষের সৃষ্টি হতো তা হলে আজ তার কী দুর্গতিই ঘটতো তা মনে করলেও বুক কেঁপে ওঠে।···এই একটী জিনিষ ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালি সৃষ্টি করতে পেরেছে কারণ সেটা বহুজনে মিলে করতে হয়নি।"

সাহিত্য যে দল বেঁধে গড়ে তোলার জিনিষ নয় একথা তিনি বার বার বলেছেন। তবু সত্ত্বেও যখন সাহিত্য সম্মিলনে ডাক পড়েছে তখন তিনি হয় পুথি সরক্ষণের কথা বলেছেন না হয় তো বাংলা ব্যাকরণ গড়ে তোলার জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টার কথা বলেছেন। সকলের মিলিত চিন্তা নিয়ে সভার প্রস্তাব রচনা হয় সাহিত্য হয়না। আধুনিক কালে নানা সাহিত্য সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে—সেই সব সঙ্ঘের একটি উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যে সব ফরমায়েসী রচনা তৈরী হয় তাদেরই সাহিত্য বলে সোল্লাসে প্রচার করা হয়। এরা ফতোয়া দিয়ে দেয়—সাহিত্যে অমুক অমুক জিনিষ থাকা চাই—সেই অনুযায়ী লেখক লেখে। ভারতবর্ষে এখন সারা ভারত লেখক সম্মেলন সুরু হয়েছে। সেখানেও নানা কথা, নানা লোক, নানা রাজনৈতিক সমস্যা ভীড় করে আসছে। তার মধ্যে সাহিত্যের আদর্শ যে অমলিন থাকছে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। এখনকার দিনে যখন সরকারী অনুগ্রহলাভ খ্যাতি লাভের অন্যতম সহজ উপায় তখন এই সব সম্মেলন যে অচিরকালের মধ্যেই উমেদারির আখড়ায় পরিণত হবে তা প্রথম বারের কলকাতা সম্মেলন থেকেই বোঝা গেছে।

শুধু আমাদের দেশেই নয়। অন্যান্য বহু দেশেই সাহিত্যিকদের সংঘ আছে। সেই সব সংঘের অসীম সরকারী প্রভাব লেখকদের উপরে। রাষ্ট্রপতিরাও সেখানে ক্রমাগত উপদেশ দিতে থাকেন রচনা কেমন হওয়া উচিত। এই রকম পরিবেশে ছোট ছোট লেখক তো দূরের কথা অনেক বড় বড় রথী মহারথীর মাথাও ঘুলিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ পাঠকদের একটি খবর জানাতে পারি। বুর্জোয়া সাহিত্যকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে গর্কী রাশিয়াতে এমন একটি লেখক-ট্রেনিং স্কুল খুলতে চেয়েছিলেন যেখানে বছরে চল্লিশটি ক্ষমতাশালী (talented) লেখকের সৃষ্টি হবে এবং বছরে পাঁচটি প্রতিভার (Genius) সৃষ্টি হবে। অনুমান করুন অবস্থাটা। এমন অর্ডারী স্কুল যেখানে প্রতি বছরে রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়র, গ্যেটে জাতীয় লোক পাঁচটি করে প্রস্তুত হচ্ছেন।

উপরোক্ত ঘটনা পড়বার পর থেকে আমার এই ধারণা হয়েছে যে সাহিত্যবিষয়ক যে সব

গভীর সত্য রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন গর্কী দলবদ্ধতার ফলে তা পারেন নি বলেই এই প্রলাপোক্তি করেছেন।

এই দলবদ্ধ সাহিত্যের আর একটা ফল সাহিত্যে মতের এবং দলে শীলমোহর মারার লোভ। যার সাহিত্যে দলের ছাপ যত ভাল করে পড়লো সে তত ভাল সাহিত্যিক। সাময়িক উত্তেজনা তাকে ততই মাথায় চড়াবে যতই ঐ উত্তেজনায় তার লেখার সুর চড়বে। আধুনিক লেখকের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যসমালোচনায়' বলেছেন "আমি কামনা করি, তাঁরা যুগ-প্রবর্তনের লোভে পড়ে তাঁদের লেখার সর্বাঙ্গে কোনো দলের ছাপের উলকি পরিয়ে তাকে সজ্জিত করা হল বলে না মনে করেন।" এই যুগপ্রবর্তনের লোভ যে অনেক সময় লেখকদের নিজস্ব মনোধর্মের বিরুদ্ধপথে তাঁদের চালিত করে একথা আমরা রবীন্দ্রোত্তর বিদ্রোহী লেখকদের জীবনে দেখেছি। তাঁদের মধ্যে অনেকে রবীন্দ্রনাথের ভাবে ভাষায় সংস্কারে লালিত কিন্তু যুগপ্রবর্তনের লোভে রবীন্দ্রবিরোধী সেজেছিলেন। বয়স বাড়তে বাড়তে সেই উদ্ধত ভঙ্গীর ছদ্মবেশ বয়ে বেড়ানো যখন কষ্টকর মনে হলো তখনই আসল রূপে দেখা দিলেন।

সাহিত্যে সমাজতন্ত্রের ইঙ্গিত, আধুনিক প্রগতিশীলতার অন্যতম লক্ষণ বলে কোন কোন মহলে স্বীকৃত হচ্ছে। নায়ক কতটা বিদ্রোহ করলো, সে বিদ্রোহ কতটা সফল হলো তার উপরে এই প্রগতিশীলতার অনেকটা নির্ভর করছে—স্বভাবতই নায়কও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে অতিমানবও হয় বটে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য নানাভাবে তিনি বলেছেন যার মূল কথা হলো কোন প্রয়োজন সাধন আমার উদ্দেশ্য নয় সাময়িক উত্তেজনার দাসবৃত্তি তো নয়ই। এই প্রসঙ্গে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীকে বুর্জোয়া কবির নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্যবিলাস বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন তাঁদের জন্যে দুটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি—

"It is always bad for an author to be infatuated with his here."

"I think that the bias should flow by itself from the situation and action, without particular indications, and that the writer is not obliged to obtrude on the reader the future historical solutions of the social conflicts pictured."

উপরের উক্তি দুটি ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের। তাঁর বক্তব্য এত স্পষ্ট যে তা আরও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা।

এমত অবস্থায় প্রশ্ন উঠবে যে তাহলে কি সমাজ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পদ্ধতির মধ্যে লেখক নিস্পৃহ দর্শক মাত্র তার কিছু করার নেই। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে সমাজের সকল রীতিনীতি সাহিত্যে যে মেনে চলতে হবে এমন কোন কথা নেই। যে রীতিনীতি সমাজে বিশেষ মূল্য লাভ করেছে সেগুলিকে সাহিত্য সোজাসুজি অস্বীকার করলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সামাজিক সত্যগুলি যদি মানবচরিত্রের মর্মগত সত্যের উপর নির্ভর করে থাকে তাহলে তার ব্যতিক্রম ঘটানোর কোন কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"সমাজ ব্যবস্থার জন্য বাঁধাবাঁধি যে নিয়ম হয়েছে সাহিত্য যদি তাকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করে সাহিত্যকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু যে-সমস্ত নীতি মানুষের চরিত্রের মর্মগত সত্য, যেমন লোককে প্রতারণা করব না, ইত্যাদি সেগুলির ব্যতিক্রম কোনকালে হতে পারে বলে মনে করি না।"

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হলো যে সামাজিক বিধিনিয়মকে সর্বদা মেনে না চলবার স্বাধীনতা সাহিত্যিকের আছে তা তিনি স্বীকার করছেন। কিন্তু একথাও সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দিচ্ছেন যে সামাজিক আইনকানুন রাখা বা ভাঙ্গার উপর সৎসাহিত্য নির্ভর করছে না—সে নির্ভর করছে রূপসৃষ্টির উপর। সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি হবে এ নিয়ে বহু আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত

রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন রূপের উপরে। তিনি বলেছেন যে মধুসূদন যখন বাংলায় এলেন তখন বিষয়বস্তু যে কিছু নতুন এলো তা নয়, নতুন এলো কাব্যরূপ। সেখানে মধুসূদনের মনোভাবের নবীনত্ব থাকলেও তা প্রধান নয়, "ভাবটি যে বিশেষরূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলিন্য।" "রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম"—এ কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন। ভাবকেও তিনি সর্বমানবের ক্ষেত্রে সমান বলে মনে করেছেন, ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য তার ভাবপ্রকাশে।

এই রূপসৃষ্টির এত কী মূল্য? কি কাজ তার? আমাদের মনের বীণার তারে কোন সুরের আলোড়ন তোলে সে। আলংকারিকেরা বলেছেন যে অলৌকিক ব্যয়ার জগৎ রসের জন্ম দেয়। যা বস্তু তার থেকে ভাবের জন্ম, যা বস্তু এবং মায়া (বিভাব অনুভাব সঞ্চারী সহযোগে) তাই হলো সাহিত্য—সেখানে রসের সুরু। চিত্তের বিভিন্ন ভাব ভালমন্দ নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় বাস্তবে। কিন্তু সেই ভাবগুলি কাব্যে একটি মাত্র প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত হয় তা হলো আনন্দ "স্বসংবিদানন্দ চর্বণ ব্যাপারঃ।" এই যে লৌকিক জগতের লৌকিক ভাব তা কেমন করে অলৌকিক কাব্যের অলৌকিক রসে পরিণত হয়—রূপের গুণে। প্রতিদিনকার জীবনে যাকে দেখি সে যদি একদিন অপরূপ হয়ে ওঠে সাজে সজ্জায় ভূষণে আভরণে সে যেমন বাস্তবতার স্পর্শ ছাড়িয়ে যায় তেমনি বহুজ্ঞাত বিষয় সাজের গুণে কাব্য হয়ে ওঠে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি একটু দীর্ঘ হলেও তুলে দিতে হলো। তিনি বলছেন, "এই যে আত্মচেতনার অনুভূতি আমরা খুঁজি (একেই কি আলংকারিক স্ব সংবিদানন্দ চর্বণ বলে উল্লেখ করেছেন)—এই অনুভূতি সর্বদাই আনন্দময়। আমি বলছি, মানুষের সর্বপ্রকার অনুভূতিই আনন্দময়। দুঃখের, বেদনার, ভয়ের অনুভূতি কোনটাকেই বাদ দিয়ে বলছি না। ধরা যাক ভয়ের অনুভূতি। কোনখানে এটা অসুখকর? না যেখানে এর সঙ্গে ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কা জড়িত—যেমন পাড়ায় বাঘ এলে মানুষ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঘের গল্প যখন পড়ছি, শিকারীর রোমহর্ষক মৃত্যুর সঙ্গে খেলার প্রসঙ্গ, সেখানে যে নিবিড় ভয়ের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে মনকে নিয়ে যায় তা সুখকর না হলে বাঘের গল্প আমরা পড়বো কেন?" যে অনুভূতির অভিজ্ঞতা কাব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে সে অনুভূতি অলৌকিকতার রসে সিক্ত হয়ে ওঠে।

ভাবের তরল স্রোত যেখানে মনের মাটিকে সর্বদা ভিজিয়ে রেখেছে সেখানে যুক্তির অবতারণা যে কঠিন কাজ এ কথা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল মনকে সবরকম যুক্তি-হীন অন্ধবিশ্বাসের হাত থেকে মুক্তি দিতে সচেষ্ট। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখাতে গিয়ে তিনি সেই বুদ্ধির উদ্বোধনের ধারাটি দেখিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য প্রভাবের সেই রূপটির কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যেখানে সংস্কারমুক্ত বুদ্ধির প্রকাশ। তাছাড়া ঐ সংস্কৃতির সংস্পর্শে আমাদের সংস্কৃতির সংকীর্ণ রূপ ঘুচলো, তার তথাকথিত 'ন্যাশন্যাল' সাহিত্যই এক-মাত্র সম্বল রইলো না। আমাদের সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য এবং পরবর্তীকালের তর্জা খেউড় প্রভৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোন দুর্বলতা ছিল না। তিনি একাধিকবার বলেছেন যে কালের বিচারে এরা টিঁকবে না। তিনি বড় করে তুলে ধরছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রকে। তাঁর মতে এঁদের দুঃসাহসেই বাংলা সাহিত্য চলতে শিখেছে। বাংলা দেশের মনের ভিতরকার শক্তির দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাঙ্গালী যে পাশ্চাত্যের চিত্তসম্পদকে গ্রহণ করতে পেরেছে, বিজাতীয় বলে নাসিকাকুঞ্চনের অবজ্ঞা দিয়ে দূরে সরিয়ে

দেয়নি এতে তার শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর মনের জমিতে নূতন ফসল ফললো—"তার একটা বিস্ময়কর প্রমাণ দেখি রামমোহন রায়ের মধ্যে...অপরিণত গদ্যেই দুর্বোধ তত্ত্বালোচনার ভিত্তি সংঘটন করতে রামমোহন কুণ্ঠিত হলেন না।" তেমনি এলেন মধুসূদন মহাকাব্যসম্ভারী মন নিয়ে। বাঙ্গালী যে 'অনুপ্রাসকণ্টকিত শিথিল ভাষার পৌরাণিক পাঁচালি প্রভৃতি গানকেই বিশুদ্ধ ন্যাশন্যাল সাহিত্য' মনে করে মধুসূদন প্রভৃতিকে ফিরিয়ে দেয়নি, আচারের সংকীর্ণতা থেকে যে আমাদের মন মুক্ত হলো তাতে তার চিৎশক্তির অসামান্যতাই প্রমাণ করেছে।"

এমনি করে সাহিত্যের ক্রমবিকাশের মধ্যে তালিকা তৈরী না করে তিনি বাঙ্গালী চিত্তের নবজাগরণের মর্মকথাটিকে তুলে ধরেছেন।

অবশেষে আর একটি সমস্যার প্রতি উল্লেখ করতে হলো, যে সমস্যা আজ আমাদের জীবনের এবং যার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি থেকে বহু মনে রাখবার মতো কথা বলেছেন।

আজ ভারতবর্ষে হিন্দীভাষাকে একটি সর্বভারতীয় ভাষা করে তোলবার সরকারী প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। অনেকের মনে এই আশা আছে যে ঐ ভাষার প্রচলনের দ্বারা সর্বভারতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সহজ হবে। একটি ভাষাকে প্রধান করে তোলবার এই যে প্রচেষ্টা এ রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেই সুরু হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি বলছেন "এতে করে যথার্থ সমন্বয় হতে পারে না। কারণ, এই একাকারত্ব কৃত্রিম ও অগভীর, এ শুধু বাইরে থেকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মিলনের প্রসার মাত্র।"

এ সম্পর্কে তিনি ইতিহাসের যে নজীর টেনেছেন তা অনেকেরই হয় তো পীড়ার কারণ হবে। তিনি বলেছেন "রাশিয়া তার অধিকৃত ছোটো ছোটো দেশের ভাষাকে মেরে রুশীয় ভাষার অধিকারভুক্ত করবার চেষ্টা করেছিল, বেলজিয়ান ফ্লেমিশদের ভাষা ভোলাতে পারলে বাঁচে।" ভাষাবৈচিত্র্যের উপর স্টীমরোলার চালানোর তীব্র বিদ্রোহ তিনি এই প্রবন্ধে করেছেন।

আরও বহু চিন্তার অপূর্ব প্রকাশ 'সাহিত্যের পথে'। পূর্বতন সংস্করণ থেকে বর্তমান সংস্করণে অতিরিক্ত আটটি প্রবন্ধের সংযোজন হয়েছে। আমরা মূলতঃ ঐগুলি থেকেই কিছু কিছু কটি-চিন্তা উদ্ধৃত করলুম। সাহিত্যরসিকরা এ গ্রন্থে তত্ত্ব ও সাহিত্য উভয় রসই পাবেন এ কথা আমাদের কাছে শোনবার অপেক্ষায় নিশ্চয় কেউ বসে নেই।

সোমেন বসু

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!

যে অসংখ্য কোষের সমবায়ে শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে; অই রক্তকে প্রাণশক্তির প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতঃই বিবিধ জটিল ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

সারিবাদি সালসা প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবত ভারতের সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদি সালসা সেবনে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, ক্ষোভ, পিত্তদুষ্ট, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্ববিধ চর্মরোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত জটিল রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, লিভারের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে প্রভূত বিক্রম বৃদ্ধন রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধ

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এম-বি-এস (পাঞ্জাব), এম-বি-এস (আয়ুর্বেদ), আয়ুর্বেদ সম্মেলন কলিকাতার ভূতপূর্ব সভাপতি।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম-বি (ক্যালি), আয়ুর্বেদ-আচার্য। শাখা—যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলিকাতা-৩৭

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা

অন্য ৩ প্রকার পুষ্টিবিধি প্রকাশ